পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	
৪৬	12.5.97			

ভারতের নবজন্ম

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

ক্যালকাটা পাবলিশার্স্
১০।৭এ, হ্যারিসন্ রোড, কলিকাতা

পাঁচ সিকা

অনুবাদক—

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

প্রকাশক—

শ্রীশরচ্চন্দ্র গুহ, বি-এ

শ্রীবারিদকান্তি বসু

প্রথম সংস্করণ

আশ্বিন, ১৩৩৯

কলিকাতা ১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার
আর্ট প্রেসে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, বি-এ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ভারতের নবজন্ম

১

ভারতের নবজন্ম হইতেছে—এই ধরণের কথা আজকাল আমাদের মধ্যে খুবই শুনা যায়। ফলতঃ, দেশে যে একটা নূতন জীবনের, নূতন চিন্তার বহুবঙ্কিম ধারা ক্রমেই ফুটিয়া উঠিতেছে, ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় ভারতের সত্য সত্যই নবজন্ম হইতেছে। যদি তাই হয়, যদি বাস্তবিকই ভারত একটা নূতন জন্ম গ্রহণ করিতে চলিয়া থাকে, তবে ব্যাপারটি কেবল তাহার নিজের পক্ষে নয়, জগতের পক্ষেও যে কত বড় অমূল্য জিনিষ হইয়া পড়ে, তাহা

বলিয়া শেষ করা যায় না। নিজের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, এই নবজন্মের অর্থ, ভারতের যে চিরন্তন ধর্ম্ম, যে সমষ্টিগত শিক্ষাদীক্ষা তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা বা পরিবর্ত্তন—এবং এ কথা বলিতে মুখ্যতঃ ও গৌণতঃ যাহা কিছু বুঝায় তাহা সবই সেই নবজন্মের অন্তর্ভুক্ত। আর জগতের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে দেখি, একটা অভিনব শক্তির অভ্যুত্থান, আর সেই শক্তির সম্মুখে কত অভিনব সম্ভাবনা। মনের যে ভঙ্গী, অন্তরাত্মার যে ভাব আধুনিক মানুষের চিন্তাধারাকে এতদিন অবধি নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিয়াছে, তাহা হইতে কত পৃথক্ ঐ উদীয়মান্ শক্তির ছন্দ—ইহার অনুরূপ কিছু পাইতে হইলে আমাদিগকে যাইতে হইবে ভবিষ্যতে, ভবিষ্যতকে নিয়ন্ত্রিত করিবে যে ভাব, যে ভঙ্গী একমাত্র তাহারই সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। সে যাহা হউক, ভারতের পক্ষে ভারতের নবজন্ম যে কি বস্তু শুধু সেই কথাটাই আপাততঃ আমি আলোচনা করিতে চাই। কারণ, ভারতের নবজীবন সমস্ত মানবজাতিকে লইয়া কি করিবে বা না করিবে, এই বড় সমস্যার আগে হইতেছে, ভারত নিজে তাহার নিজের জীবন লইয়া কি করিবে, এই ছোট সমস্যাটি। বিশেষতঃ, অনতি-

বিলম্বে এই সমস্যাটি পূরণ করাই আমাদের পক্ষে বোধ হয় একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িবে।

সকলের আগে গোড়ার প্রশ্ন হইতেছে, বাস্তবিকই ভারতের একটা নবজন্ম আসিয়াছে কি না। প্রশ্নটির উত্তর নির্ভর করিবে 'নবজন্ম' বলিতে কি বুঝি আমরা তাহার উপরে। তা ছাড়া ভবিষ্যতে কি ঘটে বা না ঘটে তাহার উপরেও অনেক নির্ভর করিবে—কারণ, জিনিষটি বর্ত্তমানে রহিয়াছে অতি অপূর্ণ অবস্থায়। পরে তাহা কি রূপ লইবে বা না লইবে তাহা এখন পর্য্যন্ত কিছু জোর করিয়া বলা যায় না। 'নবজন্ম' কথাটা ইউরোপীয় রেনাসেন্স (Renaissance) কথাটির প্রতিধ্বনি—নবজন্ম বলিতেই ইউরোপ তাহার শিক্ষাদীক্ষার যে সন্ধিমূহূর্ত্তকে প্রথম এই নাম দিয়াছিল, তাহারই চিত্র আমাদের মনে পড়িয়া যায়। কিন্তু ইউরোপের এই নবজন্মকে ঠিক নবজাগরণ বলা যায় না, তাহা একটা আমূল পরিবর্ত্তন, একটা বিপর্য্যয়। ইউরোপ আগে ছিল খৃষ্টীয়-ধর্ম্মের, টিউটন-জাতির, ফিউডল্-তন্ত্রের হাবে ভাবে অভিভূত; তাহার উপর আসিয়া পড়িল প্রাচীন গ্রীস ও রোমের শিক্ষাদীক্ষার বন্যা, তাহাতে পুরাতন ধারা ধুইয়া মুছিয়া গেল; সেখানে

স্থাপিত হইল নূতন ভাব নূতন রূপ, আর তাহার আনুসঙ্গিক বিপুল জটিল অভিনব বিধি ব্যবস্থা সব। এই ধরণের নবজন্ম ভারতে কখনও সম্ভব নয়। ভারতের নবজন্মের তুলনা ইউরোপে কতক পাওয়া যাইতে পারে আধুনিক আয়র্লণ্ডের নবীন সাধনায়। আয়র্লণ্ডের যে জাতীয় জাগরণ আজ দেখা দিয়াছে, তাহা চাহিতেছে আপনাকে প্রকাশ করিয়া ধরিবার নূতন একটা অনুপ্রেরণা,—এমন একটা অনুপ্রেরণা যাহা তাহাকে লইয়া চলিবে অন্তরাত্মার দিকে এবং এই অন্তরাত্মার শক্তিতেই সে নূতন করিয়া গড়িবে সৃজিবে বৃহৎ ভাবে। আয়র্লণ্ড এই অনুপ্রেরণা পাইয়াছে আবার তাহার প্রাচীন কেল্‌টিক্‌ শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে ফিরিয়া গিয়া—তাহার যে শিক্ষাদীক্ষা ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষার তলে এতদিন চাপা পড়িয়া ছিল। ভারতবর্ষেও এই রকমেরই একটা পুনরভ্যুত্থান ঘটিতেছে। ১৯০৫ সালের রাষ্ট্রনীতিক আন্দোলনে এই জিনিষটিই বিশেষভাবে মুখ লইয়া উঠিয়াছে। তবুও আয়র্লণ্ডের সহিত তুলনা করিলেও ভারত যে সত্য লইয়া জাগিতেছে, তাহার সবখানি হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

তারপর আর একটি জিনিষ আমাদিগকে দেখিতে

হইবে। ভারতে যে নবজীবনের চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে, তাহা এখনও একটা বিপুল অথচ অস্পষ্ট কুয়াসার মত—তাহার মধ্যে খেলিতেছে নানা বিরোধী ধারা; শুধু এখানে ওখানে দুই একটা কেন্দ্রে স্পষ্টতর, স্ফুটতর রূপায়নের চেষ্টা চলিয়াছে, এই দুই একটা স্থানেই নূতন চেতনা নিজের সম্বন্ধে সজাগ হইয়া বাহিরে দেখা দিয়াছে। কিন্তু এই সব নব রূপায়ন সাধারণের মনের মধ্যে যে সম্যক্ প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে, তাহা এখনও বলা চলে না। এগুলি ভবিষ্যতের প্রথম পরিকল্পনা,—বৈতালিকের কণ্ঠে আবাহন, অগ্রণীর হাতে মশাল। মোটের উপর আমরা দেখিতেছি, বিরাট কি এক শক্তি নূতন জগতে ভিন্নপ্রকার ক্ষেত্রে জাগিয়া উঠিতেছে। কিন্তু ছোট বড় অসংখ্য বন্ধনে তাহার প্রতি অঙ্গ এখনও আবদ্ধ—এই সব বন্ধন কতক সে অতীতে নিজেই নিজের চারিদিকে আঁটিয়া দিয়াছে, কতক বা ইদানীন্তন কালে বাহির হইতে তাহার উপর আরোপিত হইয়াছে। এই সকল কাটিয়া ছিঁড়িয়া সে চাহিতেছে মুক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে, স্বকীয় মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া ধরিতে, চতুর্দ্দিকে নিজের প্রতিভা ছড়াইয়া দিতে, জগতের উপর আপনার নাম আঁকিয়া দিতে। বাঁধন যে আস্তে আস্তে কাটিয়া চলিয়াছে তাহার শব্দ

সকল দিকেই আমরা শুনিতেছি, এখানে ওখানে একেবারে হঠাৎ ছিঁড়িয়া পড়িবার ধ্বনিও শ্রবণে আসিতেছে। তবুও মুক্তগতির স্বাচ্ছন্দ্য এখনও আসে নাই। চোখে দৃষ্টি এখনও আবছায়া, অন্তরাত্মার কোরক এই এখনও অর্দ্ধবিকশিত, মহাশক্তি এখনও উঠিয়া দাঁড়ান নাই।

নবজন্ম বা জাগরণ কথাটা ভারতের পক্ষে আদৌ প্রযোজ্য কিনা, তাহা আর একটু বিচার করিয়া দেখা দরকার। কারণ, অনেকে বলিতে পারেন যে ভারত চিরদিনই জাগ্রত, নূতন করিয়া সে আবার জাগিবে কি? কথাটার মধ্যে যে কিছু সত্য নাই, এমন নয়। বিশেষতঃ, ভারতের পূজারী বিদেশী যাঁহারা বাহির হইতে এখানে আসেন, তাঁহাদের মনে কোন পুরাতন সংস্কারের আবর্জ্জনা না থাকায়, প্রথমেই যে জিনিষটি তাঁহাদের চোখে লাগে, তাহা হইতেছে অতীতের ও বর্ত্তমানের ভারতের মধ্যে একটা সজীব সংযোগ-ধারা। এ জিনিষটি এত স্পষ্ট যে, অন্য সব জিনিষ হঠাৎ নজরে না-ও পড়িতে পারে। কিন্তু আমরা যাহারা দেশের সন্তান, আমরা ঠিক সে ভাবে দেখিতে পারি না। ভারতে যে বিপুল অধঃপতন অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে একেবারে চরমে পৌছিয়াছিল, তাহার বিষময় ফল হইতে

আমরা এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাইতেছি না। এ কথা কখনও অস্বীকার করা যাইবে না যে, ভারতের সত্য সত্যই এমন একটা সঙ্কটের কাল আসিয়াছিল—তাহা খুব বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই সত্য বটে; কিন্তু সেই অল্প সময়ের মধ্যেই কি দারুণ ক্ষতি করিয়া দিয়াছে!—যখন জীবনের সে দীপ্ত বহ্নি নির্ব্বাপিতপ্রায় হইয়া গিয়াছিল, এমন কি, একটা মুহূর্ত্ত আসিয়াছিল, যখন বোধ হইতেছিল এই বুঝি ভারতের শেষ, এইখানেই বুঝি ভারতের ইতি। তখনই রাষ্ট্রে তাহার দেখা দিয়াছিল সেই বিশৃঙ্খলতা, অরাজকতা, যাহার কল্যাণে ইউরোপের ভবঘুরে সকলে এখানে আস্তানা খুঁজিয়া পাইল। তখনই অন্তরে তাহার আসিয়া পড়িতে লাগিল ঘোর তামসিকতা, যাহার কবলে কবলিত অস্তমিত হইয়া চলিল ধর্ম্মে, শিল্প-কলায়, তাহার সকল সৃজন-প্রতিভা। দর্শন, বিজ্ঞান, বুদ্ধির সৃষ্টি বহু পূর্ব্বেই লোপ পাইয়াছিল—যাহা কিছু বা ছিল, তাহা পাইয়া বসিয়াছিল বাক্‌সর্ব্বস্ব পাণ্ডিত্যের জড় স্থাবরত্ব। অধঃপতনের চরম সীমার লক্ষণ সব সর্ব্বত্র তখন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ইহাকেই ভারত বুঝি নাম দিয়াছে সেই যুগসন্ধি বা প্রলয়—যেখানে একটা সৃষ্টির শেষ, যাহার পরে আবার নূতন সৃষ্টির আরম্ভ। এই যে

কালধর্ম্ম এবং ইহার সাথে সাথে যে আসিয়া পড়িল বাহির হইতে আগত ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষার চাপ, তাহাই ডাকিয়া আনিল ভারতের নব অভ্যুত্থান।

এই অভ্যুত্থান বুঝিতে হইলে তবে মোটামুটি তিনটি ধাপের উপর আমাদের নজর দিতে হইবে। প্রথম হইতেছে, অতীতে ভারতের সেই সমুন্নত শিক্ষাদীক্ষা ও জীবনের মাধ্যন্দিন যুগ, আর তার পরে আসিয়া পড়িল যে জড়তা ও তামসিকতার সন্ধ্যা। দ্বিতীয় হইতেছে, পাশ্চাত্যের সহিত ভারতের প্রথম সংস্পর্শ,—যখন ভারত মরিয়া পচিয়া গলিয়া প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছিল। তৃতীয় হইতেছে, কিছুদিন হইতে একটা স্পষ্ট মূর্ত্তি লইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে যে নবজীবনের স্পন্দন, যে ঊর্দ্ধমুখী গতি। একটি কথা এখানে স্মরণে রাখিতে হইবে এবং অনেকেই ন্যায্যতঃ এ কথাটির উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। তাহা এই যে, ভারত চিরদিনই—এমন কি জাতীয় জীবনের ঘোর অবসাদের মধ্যেও, অক্ষত রাখিয়াছে তাহার অধ্যাত্ম-প্রতিভা। এই বস্তুটিই ভারতকে রক্ষা করিয়াছে ভারতের প্রত্যেক সন্ধিমুহূর্ত্তে—আর আজকার যে নবজন্ম দেখা দিয়াছে, তাঁহারও গোড়ার অনুপ্রেরণা ঐ বস্তুটিরই মধ্যে।

ভারতকে যে চাপের ভার সহ্য করিতে হইয়াছে, অন্য কোন জাতি তাহাতে বহু পূর্ব্বেই দেহ-প্রাণ সমেত লুপ্ত হইয়া যাইত। এ কথা সত্য। কিন্তু তবুও স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারত প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলেও, দেহে তাহার ঘুণ ধরিয়া আসিতেছিল ; জড়ত্বের আক্রমণে এক সময়ে মনে হইয়াছিল তাহার আত্ম-শোধনের সব শক্তি বুঝি পরাহত হইয়া যায়,—জড়ত্বই ত মৃত্যু! আবার যখন এই মুক্তির, নবজীবনের দিন আসিয়াছে তখন ভারতকে তাহার নিজস্ব প্রকৃতি, তাহার অন্তরাত্মার ধর্ম্মটি ধরিয়া রহিতেই হইবে। কিন্তু তাহার যে আকৃতি, যে দেহায়তন, সেখানে অনেক কিছুই পরিবর্ত্তন ঘটিবে এমন সম্ভাবনা আছে। ভারতের সেই একই অন্তরাত্মা পুনর্জ্জীবিত হইয়া নূতন একটা আধার গড়িয়া লইবে, তাহারই প্রেরণায় নূতন রূপ সব ফুটিয়া উঠিবে দর্শনে, শিল্পে, সাহিত্যে, শিক্ষায়, রাষ্ট্রে, সমাজে—ভারতের নব-জন্মের ধরণ এই রকমেই হইবে বলিয়া মনে হয়। এই সব নূতন রূপ, অতীত ভারত যে সব সত্য প্রকাশিত করিয়াছে, তাহার বিরোধী হইবে না। কিন্তু প্রাচীন সত্যগুলিকে বিশুদ্ধ করিয়া পূর্ণতর করিয়া নূতন ভঙ্গীতে আবার প্রকাশিত করিবে।

ভারতের এই যে পুরাণী প্রকৃতি, এই যে তাহার আপনকার অন্তরাত্মা, সেটি কি? সাধারণভাবে দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, ভারতবাসীর চিন্তার ধরণে স্বভাবতঃই আছে কেমন তত্ত্বের দিকে, দার্শনিকতার দিকে ঝোঁক; প্রবল একটা ধর্ম্মপ্রাণতা, বৈরাগ্যময় ভাবুকতা তাহার যেন মজ্জাগত; তাহার দৃষ্টি সর্ব্বদাই আবদ্ধ যেন একটা পারলৌকিক আদর্শে, এই জিনিষটিই ইউরোপীয়দের চোখে পড়িয়াছে এবং তাঁহারা এমনভাবে লিখিয়া ও বলিয়া থাকেন যেন ভারতের সমস্ত স্বভাব বা প্রকৃতি বা অন্তরাত্মা ইহারই মধ্যে। তাঁহাদের মতে ভারত কি? না, অসীমতার অনুভবে অভিভূত একটা তাত্ত্বিক, দার্শনিক, ধার্ম্মিক মন—জীবনের অনুপযোগী, স্বপ্নবিলাসী, অকর্ম্মা—'মায়া' নাম দিয়া কর্ম্ম হইতে, জীবন হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াই সে চলিয়াছে। ভারতবাসীও কিছুকাল ধরিয়া অন্যান্য বিষয়ের মত এই বিষয়েও তাহার ইউ-রোপীয় শিক্ষকের ও গুরুর বাক্যে নির্ব্বিচারে সায় দিয়া আসিয়াছে। তাহার দর্শনের, তাহার সাহিত্যের, তাহার ধর্ম্মের কথা সে বুক ফুলাইয়া কহিতে শিখিয়াছে; কিন্তু আর সব বিষয়ে শুধু শিক্ষার্থী, অনুচিকীর্ষু হইতে পারিলেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়াছে। তার পরে ইউরোপই

আবার একদিন আবিষ্কার করিল যে, সৌন্দর্য্যে, শক্তিতে, অপরূপ একটা শিল্পকলাও ভারতের ছিল। কিন্তু এই পর্য্যন্ত। এতদ্ব্যতীত ভারতের আরও যে কিছু আছে বা থাকিতে পারে, তাহা ইউরোপের জ্ঞানগোচরে আদৌ আসিয়াছে কি না সন্দেহ। সুখের বিষয়, ইতিমধ্যে ভারত পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকার অভ্যাস ছাড়িতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে হইতে নিজের চোখ দিয়া নিজের অতীতকে সে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফলে অনতিবিলম্বেই তাহার বোধগম্য হইয়াছে যে, এতদিন সে যে ভাবে দেখিয়াছে অর্থাৎ যে ভাবে তাহাকে দেখান হইয়াছে, সেটি সম্পূর্ণ ভুল পথ। বাস্তবিক, জিনিষকে একান্ত এক দিক দিয়াই দেখিলে ভুল হইতে বাধ্য, আর সে ভুল পরিশেষে ধরা পড়েই। জর্ম্মণী সম্বন্ধেও কি এক সময়ে মনে হয় এই রকমের একটা ভুল ধারণা সর্ব্বসাধারণের ছিল না? দর্শনে ও সঙ্গীতে জর্ম্মণী খুব বড় বটে, কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে সে পথ ভুলিয়া আসিয়া পড়িয়াছে, কর্ম্মজগতের স্থূল উপকরণ-রাজির পূর্ণ ব্যবহার সে জানে না—সুতরাং সে হইতেছে স্বপ্ন-বিলাসীর, ভাবুকের, পণ্ডিতের জাত—সে জিজ্ঞাসু, অধ্যবসায়ী, কর্ম্মঠ সন্দেহ নাই, কিন্তু রাজনীতিক দক্ষতা

হিসাবে পঙ্গু—একদিকে কি মহান্, আর একদিকে আবার কি তুচ্ছ, এই জর্ম্মণী—admirable ridiculous Germany. কি নিদারুণ আঘাতে ইউরোপের এই যে ভুল ভাঙ্গিয়া গেল, তাহা আমরা জানি। ভারতের নবজীবন পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইলে, ভারত-প্রতিভার সত্যকার প্রকৃতি ও সামর্থ্য দেখিয়াও ইউরোপের ভুল ভাঙ্গিবে—সেই একই রকম দারুণ আঘাতের ফলে নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু তবুও যথেষ্ট মাত্রায় আশ্চর্য্য হইয়া যাইবার মত জিনিষ সেখানে মিলিবে।

এ কথায় কোন সন্দেহই নাই যে, ভারতীয় চিত্তের আসল কলকাঠি হইতেছে আধ্যাত্মিকতা। অসীমের অনুভব তাহার জন্মগত। ভারত গোড়া হইতেই দেখিয়া বুঝিয়া আসিয়াছে—এমন কি, তর্কবুদ্ধির শুষ্ক বাদ বিচারের যুগে, ক্রম-ঘনায়মান অজ্ঞানের যুগেও এই সূক্ষ্মবোধ তাহার লোপ পায় নাই—যে জীবনের যত বাহ্যিক রূপায়ন, কেবল মাত্র তাহারই আলোকে জীবনকে যথাযথ ধরা যায় না, কেবলমাত্র তাহারই শক্তিতে জীবন যথাযথ যাপন হয় না। স্থূলের নিয়ম, স্থূলের শক্তির মহত্ত্ব সম্বন্ধে সে খুবই সজাগ ছিল; জড়-বিজ্ঞানের যে কি প্রয়োজন তাহা তাহার দৃষ্টিকে কখনও এড়াইয়া যাইতে পারে

নাই ; দৈনন্দিন জীবনের জন্য যে সব শিল্পকলা দরকার তাহাতেও সে অকুশলী ছিল না। কিন্তু সে জানিত যে, স্থূল যতক্ষণ স্থূলের অতীত যাহা, তাহার সহিত সত্য সম্বন্ধে সম্মিলিত না হয়, ততক্ষণ স্থূল আপনার পূর্ণ ব্যঞ্জনা পায় না ; সৃষ্টির যে জটিল বৈচিত্র্য তাহা পরিচিত মানুষী-সংজ্ঞার সহায়ে ব্যাখ্যাত হয় না, তাহা মানুষের স্থূল দৃষ্টির গোচরীভূত নহে ; স্থূলের পিছনে, মানুষের নিজেরই ভিতরে আছে এমন আরও সব শক্তি, নৈমিত্তিক জীবনের সাধারণ জ্ঞানে, যাহা তাহার কাছে ধরা দেয় না ; মানুষ নিজের সত্তার খুব সামান্য অংশেরই সম্বন্ধে সচেতন ; দৃষ্টকে ঘিরিয়া রহিয়াছে অ-দৃষ্ট; ইন্দ্রিয়কে ঘিরিয়া রহিয়াছে অতীন্দ্রিয়—সসীমকে চিরদিনই ঘিরিয়া রহিয়াছে অসীম। ভারত আরও জানিত যে, আপনাকে ছাড়াইয়া উঠিবার শক্তি মানুষের আছে, বর্ত্তমানে সে যাহা, তাহা অপেক্ষা নিজেরই পূর্ণতর গভীরতর সত্তা একটা লাভ করিতে সে পারে। ইউরোপ আজকাল মাত্র এই সব সত্য দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে ; তবুও এখনও এ সব সত্য তাহার কাছে এত বৃহৎ যে, তাহার সাধারণ বুদ্ধির কাছে ইহা সহজ হইয়া পড়ে নাই। কিন্তু ভারতের দৃষ্টির সম্মুখে পূর্ণ ব্যক্ত ছিল

মানুষকে ছাড়াইয়া রহিয়াছে যে সব অগণিত দেবতা, দেবতাকে ছাড়াইয়া রহিয়াছে যে ইশ্বর, ঈশ্বরকে ছাড়াইয়া রহিয়াছে যে মানুষের নিজেরই অনির্ব্বচনীয় অনন্ত সত্তা। ভারত দেখিয়াছে যে এই জীবনকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়া চলিয়াছে আরও সব জীবনের পরিক্রম, বর্ত্তমান মানসকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়া চলিয়াছে আরও সব মানসের পরিক্রম, সকলের উপরে উদ্ভাসিত আত্মার মহিমা। এই দৃষ্টি তার ছিল বলিয়াই ভারত পাইয়াছে একটা প্রশান্ত দুঃসাহস—সে দৃষ্টিতে নাই কোন সঙ্কোচ, নাই কোন ক্ষুদ্রতা। ইহারই কল্যাণে যে কাজে দরকার অন্তরাত্মার বল, বুদ্ধিবৃত্তির বল, মনের বল, প্রাণের বল, তেমন কাজে কখনও সে পশ্চাৎপদ হয় নাই। ভারত মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে যে, এমন কোন বস্তু নাই, যাহা মানুষে আধিকার করিতে পারে না—প্রয়োজন শুধু ইচ্ছাশক্তিকে, জ্ঞানশক্তিকে শাণিত সমর্থ করিয়া তোলা। অন্তরের মধ্যে রহিয়াছে যে লোকপরম্পরা তাহা মানুষ জয় করিতে পারে, মানুষ হইতে পারে স্বরূপস্থ পুরুষ; মানুষ দেবতা হইতে পারে, ঈশ্বরের সহিতও একীভূত হইতে পারে, এমন কি, হইয়া যাইতে পারে অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্ম।

কিন্তু কেবল সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াই ভারত সন্তুষ্ট হয় নাই, সিদ্ধান্তের সহিত সাধনার পথও সে বাহির করিয়াছে। যুক্তিসিদ্ধ যাহা, তাহার অব্যর্থ প্রয়োগ কি করিয়া হইতে পারে, যাহা ভিতরে বোধ মাত্র, তাহাকে জাগ্রতে শৃঙ্খলার সহিত প্রকট, স্থিরপ্রতিষ্ঠ করা যায় কি রকমে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই বস্তুমুখী কর্ম্ম-কৌশল, এই ব্যবহারবুদ্ধিও ভারতের দার্শনিকতার ধাতুগত বিশেষত্ব। যুগের পর যুগ ভারত এই রকমে যে তাহার দিব্যদৃষ্টিকে ধরিয়া চলিয়াছে, উহাকে বাস্তবে পরিণত করিতে প্রয়াস করিয়া আসিয়াছে, এই অভ্যাসের ফলে তাহার আধ্যাত্মিকতার মধ্যে অব্যর্থ অঙ্গরূপে দেখা দিয়াছে, সূক্ষ্মের দিকে একটা প্রবল ঝোঁক, অসীমকে ধরিবার, অধিকার করিবার একটা দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা—ইহা হইতেই আসিয়াছে ভারতের সে সদা-জাগ্রত পারত্রিকবুদ্ধি, তাহার ঊর্দ্ধমুখী ভাবুকতা, তাহার 'যোগ'-বিদ্যা, তাহার দর্শনের, শিল্পকলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু ভারতের অন্তরাত্মার ইহাই সবখানি ছিল না, হইবার কথাও নয়। পার্থিব লোকে যে আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ, তাহা শূন্যের উপর গজাইতে পারে না।

আমাদের পর্ব্বতরাজির শিখর সব স্বপ্নের ভোজবাজীর মত কি মেঘের জঠর হইতে উঠিয়া পড়িয়াছে, মাটির উপর কি তাহাদের প্রতিষ্ঠা নাই? ভারতের অতীতের দিকে তাকাইয়া দেখ। আধ্যাত্মিকতার অব্যবহিত পরেই যে জিনিষটা চোখে পড়ে তাহা হইতেছে একটা বিরাট প্রাণশক্তি—জীবনে অফুরন্ত সামর্থ্যের আনন্দের খেলা, সৃজনকর্ম্মে একটা অসম্ভব রকম প্রাচুর্য্য। ন্যূনপক্ষে তিন হাজার বৎসর, বাস্তবিক কিন্তু আরও অনেক বেশী কাল, ধরিয়া ভারত-প্রতিভা অজস্র অনর্গল ভাবে দুই হাতে ফেলিয়া ছড়াইয়া নিত্যই নূতন নূতন পথে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে কত রকমারী রাষ্ট্র—গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, রাজচক্রবর্ত্তী-তন্ত্র—কত দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য—কত মন্দির, স্মৃতিস্তম্ভ, ইষ্টাপূর্ত্ত,—ধর্ম্মসম্প্রদায়, সাধনামার্গ, শাস্ত্র, অনুষ্ঠান, বিধান, রাজনীতি, সমাজনীতি—ব্যবসা, বাণিজ্য, চিকিৎসা, ঐহিক পারত্রিক সকল রকম বিদ্যা—নাম করিয়া তাহার আর শেষ করা যায় না। আর ইহাদের প্রত্যেকটিতে সে যে কি পরিমাণ কর্ম্মঠতা দেখাইয়াছে, তাহার লেখাজোখা নাই। সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে ত সে সৃষ্টি করিয়াই চলিয়াছে,—তৃপ্তি নাই, শ্রান্তি নাই!

শেষ যেন সে কিছুতেই হইতে দিবে না—বিশ্রাম লইবার, হাঁপ ছাড়িবার, কিছুকালের জন্য শক্তি সংগ্রহের জন্য চুপ করিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া থাকিবার প্রয়োজন যেন মোটেও সে অনুভব করে না। নিজের বাহিরেও সে আপনাকে ছড়াইয়া দিল। ভারতের নৌ-বহর সমুদ্র পার হইয়া চলিল। তাহার কাণায় কাণায় ভরা ঐশ্বর্য্য সম্পদ্ উপচিয়া গিয়া পড়িতে লাগিল জুডিয়ায়, মিশরদেশে, রোমরাজ্যে। সাগরের দ্বীপ-পুঞ্জ সব তাহার উপনিবেশ বক্ষে ধারণ করিল, দিকে দিকে ছড়াইয়া দিল তাহার শিল্প, তাহার কাব্য, তাহার ধর্ম্মমত। ভারতের পদচিহ্ন পাওয়া যায় মেসোপেটেমিয়ার বালুরাশির অন্তরে। তাহারই ধর্ম্ম গিয়া জয় করিল চীন, জাপান আর পশ্চিমে প্রসারিত হইয়া চলিল পালেস্তিন, আলেকসন্দ্রিয়া অবধি। উপনিষদের রূপকাবলী, বৌদ্ধদিগের মহাবাক্য প্রতি-ধ্বনিত হইয়া উঠিল খৃষ্টের কণ্ঠে। ভারতের মাটিতে যেমন, তেমনি ভারতের কর্ম্মেও সর্ব্বত্রই আমরা দেখিতে পাই এই অপরিমেয় জীবনীশক্তির উচ্ছ্বসিত প্রাচুর্য্য। ইউরোপের পণ্ডিতেরাই ত অনুযোগ করিয়া থাকেন যে ভারতের স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে, শিল্পে, অভাব পরি-

মাণের—ঐশ্বর্য্যকে রাখিয়া ঢাকিয়া দেখাইবার কোন ইচ্ছাই নাই সেখানে; শূন্যস্থান বা ফাঁক কোথাও নাই, প্রত্যেক ছিদ্রটি সে মণিমুক্তা দিয়া ভরিয়া দিয়াছে, প্রত্যেক অবকাশে ফুটাইয়া ধরিয়াছে অলঙ্কারের আতিশয্য। এই স্বভাব তাহার দোষের হউক কি গুণের হউক, সে বিচার আমরা করিতেছি না। আমরা বলিতেছি, ভারতের ছিল জীবনীশক্তির প্রাচুর্য্য, অন্তরে অনন্তের ভরাট আবেগ আর তাহারই অব্যর্থ পরিণাম হইতেছে ঐ স্বভাব। ভারত দুই হাতে তাহার ঐশ্বর্য্য বিতরণ করিয়া দিয়াছে, কারণ, না করিয়া তাহার উপায় ছিল না। নিখিল অনন্ত আপন আয়তনের এতটুকু ফাঁক পর্য্যন্ত জীবনীশক্তিতে, প্রাণের স্পন্দনে পরিপূর্ণ করিয়া ধরিয়াছে—কেন? কারণ, অনন্ত যে অনন্ত!

কিন্তু এই যে চরম আধ্যাত্মিক-বোধ আর এই যে জীবনীশক্তির প্রাচুর্য্য, পার্থিব ভোগের সৃজনের আনন্দ—কেবল এই দুইটিই অতীত ভারতের ভাব-ধারার সবখানি নয়। উপরে ইন্দ্রনীল আকাশের প্রশান্ত অনন্ত বিস্তার আর নীচে গ্রীষ্মতাপে উত্তেজিত উর্ব্বর বনভূমির উচ্ছৃঙ্খল সম্পদ্—ভারতের চিত্র এরূপ নহে। একযোগে এতখানি ঐশ্বর্য্য দেখিবার অভ্যাস যাহার নাই,

তাহারই দৃষ্টিতে বোধ হয়, এই যে সব যায়গা জুড়িয়া অলঙ্কারে ভরিয়া রূপ ফলাইয়া তুলিবার প্রয়াস, ইহা কেবল উচ্ছৃঙ্খল আতিশয্যের বিলাস, এখানে তাল মানের, সুঠাম গঠনের, পরিষ্কার সামঞ্জস্যের নিতান্তই অভাব; এখানে আছে শুধু বিরাট হট্টগোল। ভারতের অন্তরের ছিল আর একটি ভাব-ধারা—সেটি হইতেছে সমর্থ বিচারবুদ্ধি। এই বৃত্তিটি তাহার একদিকে যেমন ছিল স্থির, আত্মস্থ, অন্যদিকে তেমনি ছিল বহুমুখী। একদিকে যেমন চলিত বৃহৎকে আলিঙ্গন করিতে, অন্যদিকে তেমনি চলিত ক্ষুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে; তাহা যেমন ছিল শক্তিমান, তেমনি ছিল নিপুণ—তত্ত্বকে যখন সে ধরিতে যায় তখন বিরাট বিশাল তাহার গতিচ্ছন্দ, আবার ক্ষুদ্র বস্তুকে লইয়া যখন তাহার কারবার, তখন সেখানে তেমনি পাই—পদে পদে পুঙ্খানুপুঙ্খ অতিসূক্ষ্ম অনুসন্ধিৎসা। এই যে বিচারবুদ্ধি, তাহার প্রধান লক্ষ্যই ছিল শৃঙ্খলার দিকে—তবে সে-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত ছিল ভিতরের একটা নিয়মের, বস্তুর অন্তরের সত্যের উপরে। ভারত ভিতরের, অন্তরের দিকে তাকাইয়া চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা পরম নিষ্ঠা সহকারে পরীক্ষা করিয়া চলিয়াছে সেই ভিতরের অন্তরের জিনিষকে কি করিয়া

বাহিরে প্রয়োগের মধ্যে মূর্ত্ত করিয়া ধরা যায়। কারণ, ভারত হইতেছে ধর্ম্মের ও শাস্ত্রের পীঠস্থান। ব্যষ্টিগত হউক আর বিশ্বগত হউক, প্রত্যেক কর্ম্মচেষ্টার ভিতরের সত্য কি, ছন্দ কি অর্থাৎ ধর্ম্ম কি, ভারত তাহাই খুঁজিয়াছে। সেইটি যখন সে পাইয়াছে, তখন তাহাকে বাস্তব জীবনের ধারায় ঢালিবার চেষ্টা করিয়াছে, নানারূপের মধ্যে, খুঁটি নাটি জটিলতার মধ্যে, সাজাইয়া গুছাইয়া ফলাইয়া ধরিতে চাহিয়াছে। ভারতের আদিযুগ উদ্ভাসিত অধ্যাত্মের আবিষ্কারে। ভারতের মধ্যযুগে শেষ হইল ধর্ম্মের আবিষ্কার। আর সর্ব্বশেষ যুগে শাস্ত্র আনিয়া দিল প্রয়োগের পুঙ্খানুপুঙ্খ বহুল জটিল বিধি বিধান। এই তিনটি ধারা তাই বলিয়া আবার পরস্পর পরস্পর হইতে একান্ত পৃথক্ ও বিচ্ছিন্ন কখনও ছিল না, তাহারা একসঙ্গেই সর্ব্বদা চলিয়াছে।

সমস্ত জীবনটি বিচিত্র রকমে নানা ভঙ্গীতে ফলাইয়া খেলাইয়া তুলিবার জন্যই ভারতে গড়িয়া উঠিল যত বিদ্যা, যত শাস্ত্র, তাহার চরম অভিব্যক্তি পাই এই শেষ যুগে। অশোকের সময় হইতে মুসলমানদের আগমনের অনেক পরে পর্য্যন্ত—এই সুদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া ভারতের সজাগ মস্তিষ্ক যাহা সৃষ্টি করিয়াছে, আর

কিছু নয়, কেবল তাহার পরিমাণটি দেখিলেই চমৎকৃত হইতে হয়। একথার প্রমাণ সম্প্রতি গবেষকমণ্ডলীই দিতেছেন। তবুও আমাদের মনে রাখা উচিত যে, পণ্ডিতেরা এ পর্য্যন্ত যাহা উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা এখনও যাহা পড়িয়া আছে, তাহার ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, আর এখনও যাহা আছে, তাহা আবার এককালে যাহা ছিল তাহার অতি সামান্য ভগ্নাংশ। মুদ্রাযন্ত্রের যখন আবিষ্কার হয় নাই, আধুনিক বিজ্ঞান যখনও তাহার সুখ-সুবিধা লইয়া দেখা দেয় নাই, তখন এই যে বিপুল জ্ঞানের সৃষ্টি ও প্রসার চলিয়াছিল, তাহার তুলনা আর কোথাও মিলে না। আমরা আজ যে সব সহায় সুযোগের অধিকারী, তাহা কিছু না পাইয়াও এক স্মৃতিশক্তিকে আশ্রয় করিয়া আর ক্ষণভঙ্গুর তালপত্রকে যন্ত্র করিয়াই বিকাশ পাইয়াছে সেই সব পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা, সেই সব অজস্র রচনা। এই বিশাল অতিকায় সাহিত্য কেবল যে দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্ব, যোগ ও সাধনা, কাব্য নাটক, অলঙ্কার ব্যাকরণ, চিকিৎসা, জ্যোতিষ লইয়াই ব্যাপৃত ছিল, তাহা নয়। সমস্ত জীবনকে ইহা জুড়িয়াছিল —রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, চিত্রবিদ্যা হইতে নৃত্যবিদ্যা পর্য্যন্ত যাবতীয় চতুঃষষ্টিকলা, যাহা কিছু এই পৃথিবীতে

মানুষের কাজে আসিতে পারে বা যাহাতে মানুষের মন আকৃষ্ট হইতে পারে, সমস্তই এখানে ছিল। এমন কি, অশ্ব ও হস্তী কিরূপে লালন পালন করিতে হয়, তাহার অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবস্থা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। আর এই সব প্রত্যেক বিষয় লইয়া এক একটি পৃথক্ শাস্ত্র গড়িয়া তোলা হইয়াছিল, প্রত্যেক বিদ্যারই ছিল নিজের নিজের একটা পরিভাষা, নিজের নিজের একটা বিশাল সাহিত্য। বিষয় খুব বৃহৎ খুব প্রয়োজনীয় হউক আর অতি ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর হউক, সে সকলের চর্চ্চায় সর্ব্বত্রই সমভাবে ভারত ঢালিয়া দিয়াছে সেই একই উদার ঋদ্ধ সূক্ষ্ম চরম বিচারবুদ্ধি। এক দিকে ছিল তাহার একটা অতর্পণীয় কৌতূহল, জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জানিবার আকাঙ্ক্ষা; আবার আর একদিকে ছিল তেমনি শৃঙ্খলার উপর পরিপাটি করিয়া সাজান-গোছানর উপর একটা সহজ টান; সকল জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, ঠিক ঠিক মাত্রাটি ছন্দটি ধরিয়া জীবনের পথে চলিবার একটা নিবিড় সঙ্কল্প। উপরে সমস্তকে ব্যাপিয়া ছিল ভারতের আপন মজ্জাগত সহজাত আধ্যাত্মিকতা, নীচে কর্ম্মজগতে তাহার ছড়াইয়া ছিল একটা অফুরন্ত প্রাণশক্তির সৃজন-প্রতিভা, সতেজ

জীবন-ধারার উদাত্ত আবেগ আর এই দুইএর মাঝখানে, দুইটির মধ্যে আদান-প্রদানের সেতু তুলিয়া ধরিয়াছিল এমন একটি সমর্থ, তীক্ষ্ণ, সতর্ক বিচারবুদ্ধি, যাহা কেবল যুক্তির ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু কর্ত্তব্যের ক্ষেত্রে, রসজ্ঞতার ক্ষেত্রেও—এই তিনটি ধারার প্রত্যেকটিতে চরম সৃষ্টিতৎপরতাকেই অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদীক্ষায় পাই যে অপরূপ সামঞ্জস্য, তাহা এই রকমেই গড়িয়া উঠিয়াছিল।

ফলতঃ, এতখানি জীবনীশক্তি, এতখানি বিচারবুদ্ধি যদি না থাকিত তবে ভারত তাহার আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তি লইয়া যাহা করিয়াছে, তাহা কখনও করিতে পারিত না। প্রাণশক্তি যেখানে অর্দ্ধমৃত, বুদ্ধিবৃত্তি যেখানে অবজ্ঞাত, নিপীড়িত, সেই রিক্ত মাটিতেই যে আধ্যাত্মিক-প্রতিভা সব চেয়ে ভাল ফুটিয়া উঠে—ইহা মস্ত ভুল ধারণা। এই ভাবে যে আধ্যাত্মিকতা ফুটিয়া উঠে, তাহার মধ্যে থাকে একটা অস্বাস্থ্যের, দুঃস্থতার অস্বাভাবিক উগ্রতা, পরিণামে তাহার একটা দারুণ প্রতিক্রিয়া আসিতে বাধ্য। বরং যে জাতি যত সমৃদ্ধ জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছে, যত নিবিড়ভাবে চিন্তা করিয়া আসিয়াছে, সেই জাতির আধ্যাত্মিকতাও হয় তত সমুন্নত, তত

সুগভীর, তত বৈচিত্র্যময়, প্রতিপদে তত ফলপ্রসূ। ইউরোপ এই এতদিন ধরিয়া যে বিপুল জীবনীশক্তি, বিরাট চিন্তাশক্তির খেলাই খেলিয়া আসিয়াছে, তার ফলেই ত বর্ত্তমানে আজ দেখিতেছি. তাহার মধ্যে একটা সত্যকার আধ্যাত্মিক-জিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছে। ইউরোপের আধ্যাত্মিকতা একদিন ছিল জীবনরূপ মহাব্যাধির দীন ভিষক্‌, আজ শুধু সেই আধ্যাত্মিকতার মধ্যে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে একটা উদার গভীর প্রশান্ত দৃষ্টি। ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনার ধারায় যে জিনিষটি ইউরোপের চোখে লাগে, তাহা হইতেছে বৌদ্ধেরা ও মায়াবাদীরা প্রচার করিয়াছেন যে বৈরাগ্য, জীবনের প্রত্যাখ্যান। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে, এটি হইতেছে ভারতের দার্শনিক চিন্তা-ধারার একটিমাত্র দিক্‌, আর এই দিক্‌টির উপর অত্যধিক জোর পড়িয়াছিল তখন, ভারত যখন অবনতির পথে। তা ছাড়া, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতের জিজ্ঞাসাবৃত্তির ধরণই ছিল এই রকম, কোন একটি তত্ত্বকে পাইলে—সে তত্ত্ব আধ্যাত্মিক হউক আর আধিভৌতিক হউক—কেবল সেইটিকে ধরিয়া কতদূর কোথায় চলিয়া যাওয়া যায়, তাহা সে পরীক্ষা করিয়া

দেখিতে চাহিত। প্রত্যেক বিষয়টিকে ভারত এই রকমে একান্ত করিয়া দেখিত, তাহার অন্তর্গত সকল খুঁটিনাটির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণের জন্যও বটে, আবার তাহার মধ্যে আছে কোন্ অনন্ত, কোন্ চরম নিত্য-সত্য,—কোন্ অতলের, কোন্ সমুচ্চের শেষ সীমা, তাহাই আবিষ্কার করিতে। ভারত জানিত যে, সাধারণ সহজ মানুষের মন হইতেছে তামসিক স্থিতি-শীল—জ্ঞানের চিন্তার উপলব্ধির পথে নূতনের প্রতি, অবাধ অগ্রগতির প্রতি তাহা বাধা দিয়াই দাঁড়ায়; আর মনের গতির মধ্যে একটা আতিশয্য, অতিমাত্রা না থাকিলে সে বাধা ভাঙ্গিয়া ফেলা যায় না। তাই ভারত এই আতিশয্যের অতিমাত্রার পথে চলিয়াছিল অসীম সাহসে অথচ অটুট পদবিক্ষেপে। তাই দার্শনিক চিন্তার, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রত্যেক ধারা, প্রত্যেক উপধারার জের শেষ পর্য্যন্ত সে টানিয়া চলিয়াছিল, সেই শেষ প্রান্ত হইতে সমগ্র সৃষ্টিকে কি রকম দেখায়, সেইখানে দাঁড়াইয়া কোন্ সত্য, কোন্ শক্তিকে অধিকার করা যায়, তাহা পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিল। ভারত যখন জানিতে চাহিল অতিপ্রাকৃতকে, পরাপ্রকৃতিকে, তখন প্রকৃতি ছাড়াইয়া যত উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা

যায় তাহার চেষ্টা সে করিল, দিব্যধর্ম্মের খোঁজে গিয়া দেবতাদের লোকও পার হইয়া চলিয়া গেল। ঈশ্বর পর্য্যন্ত তাহার চোখে ছোট হইয়া পড়িল—আধ্যাত্মিক নাস্তিকতার চরম সে দেখাইল ব্রহ্মবাদে, শূন্যবাদে। আবার যখন বিপরীত দিকে চলিল, তখনও দুরন্ত সাহসে সোজাসুজি খোলাখুলি প্রচার করিল একেবারে জড় নাস্তিকবাদ—ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ—তাহার মধ্যে কোন রকম ধর্ম্মবুদ্ধি বা সাধুগিরিকে এতটুকু আমল সে দেয় নাই। অবশ্য এই ভাবটা ভারতের ছিল খুব একটা অবান্তর দিকের কথা, ভারতের যে চিরপিপাসু জিজ্ঞাসা-বৃত্তি তজ্জনিত একটা খেয়াল মাত্র।

সকল ক্ষেত্রেই দেখি এই একই ধারা। ভারতে যে আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে এক দিকে পাই যেমন আত্ম-প্রতিষ্ঠার চরম-স্বাতন্ত্র্যের, প্রভুত্বের, ভোগাধিকারের জন্য অদম্য তৃষ্ণা ; অন্যদিকে ঠিক তেমনি পাই আত্মত্যাগের চরম—নিজেকে সর্ব্বতোভাবে ঢালিয়া মুছিয়া দিবার জন্য ঐকান্তিক ব্যাকুলতা। জীবনযাত্রায় যখন সে ধনদৌলত চাহিয়াছে, তখন রাজার ঐশ্বর্য্যও তাহাকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই ; আবার দারিদ্র্যকে যখন সে বরণ করিয়া লইয়াছে, তখন একেবারে দিগম্বর

হইয়া বসিতেও তাহার কোন কুণ্ঠা হয় নাই। বিশেষ ভাব বা আদর্শ তাহার যতই প্রিয় হউক, বিশেষ আচার রীতি তাহার যতই অভ্যস্ত হউক, ভারতের জ্ঞানের দৃষ্টি কোন দিন তাহার মধ্যেই একান্ত বদ্ধ অন্ধ হইয়া পড়ে নাই। সমাজ-শৃঙ্খলার জন্য একদিন তাহাকে জাতি-ভেদের স্থূল কাঠামটিকেই আঁকড়িয়া ধরিয়া পড়িতে হইয়াছিল, কিন্তু তখনও সে এ ভুলটি করে নাই যে, মানুষের অন্তরাত্মাকে, মানুষের মনকে কখন জাতির পাঁতিতে বাঁধা যাইতে পারে। তখনও নীচাদপি নীচের মধ্যে সে দেখিয়াছে নারায়ণকে। ভারত বৈষম্যের উপর জোর দিয়াছে যেন ফিরিয়া আবার সেই বৈষম্যকে অস্বীকার করিবার জন্যই। অবস্থা ও প্রয়োজনের বশে রাষ্ট্রক্ষেত্রে একদিন তাহাকে রাজ-তন্ত্রকেই অত্যধিক পরিমাণে বড় করিয়া ধরিতে হইয়াছিল, রাজাকে 'নর-দেবতা' বলিয়াই ঘোষণা করিতে হইয়াছিল। দেশের শক্তিকে এক কেন্দ্রে সংহত না করিয়া, চারিদিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলে বলিয়া আগে যে ছিল প্রতিনিধি-শাসিত পৌর-রাষ্ট্র সব সেগুলির ধ্বংস সাধনই তাহাকে করিতে হইয়াছিল। বিভিন্ন পৌর-রাষ্ট্রের পরস্পরের মধ্যে একটা স্বচ্ছন্দ সম্মিলনও

দেশের একত্বের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ভারতের মাটিতে তাই গণতন্ত্রের বিকাশ হইতে পারে নাই। কিন্তু তবুও গণতন্ত্রের যে মূল তত্ত্ব, তাহার প্রয়োগ আমরা যথেষ্ট পাই, গ্রাম্য-সংহতির মধ্যে, পৌর-জানপদ-সভাসমিতির মধ্যে, এমন কি, জাতিবন্ধনের মধ্যেও। জনসাধারণের মধ্যেও সকলের আগে ভারতই ভাগবতশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল এবং রাজা যখন প্রভাবপ্রতিপত্তির চরম শিখরে দাঁড়াইয়া, তখনই তাঁহার মুখের উপরে সে বলিয়া উঠিয়াছে, 'হে রাজন্! জন-সাধারণের প্রধান দাস—গণদাস ছাড়া তুমি আর কি?' ভারত সত্যযুগের যে কল্পনা করিয়াছে, তাহা হইতেছে আধ্যাত্মিক অরাজকতা। এই আধ্যাত্মিকতাকেও ভারত একেবারে চরম সীমায় ঠেলিয়া লইয়াছিল; তবুও ত একটা সুদীর্ঘ যুগ ধরিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবনের স্থূল ভোগের রহস্যও তলাইয়া দেখিতে সে বিরত হয় নাই—এখানেও অন্নময় আয়তনেও সে চাহিয়াছিল সকল রকম 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' সিদ্ধির সম্পদ্, সকল রকম তীব্র-গভীর অনুভব উপলব্ধি। তবে এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। ভারত এই যে দুই সম্পূর্ণ বিপরীত, পরস্পর বিরোধী পথে যুগপৎ ছুটিয়া

চলিয়াছে, তাহার মধ্যে কখন কোন বিশৃঙ্খলতা দেখা দেয় নাই। সুখবাদী হইয়া পড়িলেই ইউরোপকে আমরা একাধিকবার দেখিয়াছি যে রকম অবাধ অনাচারে ডুবিয়া যাইতে, ভারতে অতি ঘোর সুখবাদের যুগেও তাহার তুলনা কিছু পাই না। কারণ, ভারতের আছে যে একটা আধ্যাত্মিক, একটা নৈতিক প্রতিষ্ঠা, শুধু তাই নয়; ভারতের চিন্তাশীলতা ভারতের সৌন্দর্য্যবোধও এই বিষয়ে ভারতকে রক্ষা করিয়াছে। চিন্তাশীলতার মধ্যে আছে নিয়মানুবর্ত্তিতা, সৌন্দর্য্যবোধের মধ্যে আছে ছন্দের বোধ—উভয়েই বিশৃঙ্খলতার পরিপন্থী। ভারত সব বিষয়েই একেবারে অতিমাত্রায় গিয়া পৌঁছিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই অতিমাত্রার মধ্যেই সে আবার মাত্রা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহার প্রয়োগে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে একটা নিয়ম, তাল মান, সুষ্ঠু রূপায়ন। তা ছাড়া, অতিমাত্রার দিকে এই তীব্র টানের সাথে সাথেই ভারতের সহজাত স্বভাবসিদ্ধ ছিল আর একটি বৃত্তি— সামঞ্জস্যের বৃত্তি, বহুকে, নানাকে, একের অখণ্ডের মধ্যে সাজাইবার কৌশল। ইহারই কল্যাণে, প্রত্যেক গতি-ধারার চূড়ান্ত জের টানিয়া আবার সে ফিরিয়া আসিয়াছে, এইভাবে যে সব জ্ঞান সে আহরণ করিয়াছে তাহাদিগকে

আবার মিলাইয়া এক করিয়া লইয়াছে, কর্ম্মসাধনায় প্রতিষ্ঠানরচনায় স্থাপিত করিয়াছে একটা সঙ্গতি, সম্মেলন। গ্রীক-জাতি ছন্দ ও সঙ্গতি পাইয়াছিল নিজেকে সর্ব্বদা সীমার ভিতরে বাঁধিয়া রাখিয়া—সীমানা কাটিয়া কাটিয়া; কিন্তু ভারতের ছন্দ ও সঙ্গতির মূল তাহার বিচারবুদ্ধি, তাহার শ্রেয়োবোধ, তাহার রসানুভূতির সহজ-শৃঙ্খলা, তাহার মনের ও প্রাণের সুসমঞ্জস প্রেরণা।

এই তথ্যগুলি এমন করিয়া বিশদভাবে বলিতে হইতেছে, কারণ, অনেকে এ সব কথা সহজেই ভুলিয়া যান—তাঁহাদের দৃষ্টি আবদ্ধ কেবল শেষ দিকের কয়েকটি যুগে ভারতের চিন্তা ও ভাবে যে সকল ধরণ-ধারণ অতিকায় হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহারই মধ্যে। কিন্তু শুধু এই গুলির উপরেই জোর দিয়া চলিলে ভারতের অতীত সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহাতে অনেক ফাঁক, অনেক ভুল থাকিয়া যাইবে; ভারতের শিক্ষাদীক্ষার অর্থ কি, কোন্ নিবিড় অনুপ্রেরণায় সে চলিয়াছে, তাহার অখণ্ড রূপ আমরা কখনও ধরিতে পাইব না। অতীত চলিয়া যাইতে যাইতে ভাটার মুখে যে শেষ পলিমাটি রাখিয়া গিয়াছে তাহাই হইতেছে বর্ত্তমান। এই বর্ত্তমান হইতেই আবার ভবিষ্যতের আরম্ভ, সন্দেহ নাই। কিন্তু

এই বর্ত্তমানের মধ্যে সুপ্ত রহিয়াছে ভারতের সমস্ত অতীত—তাহা নষ্ট হয় নাই, নবরূপ ধরিয়া আপনাকে আবার প্রকাশিত করিবার জন্যই তাহা গোপনে অপেক্ষা করিতেছে। ভারতের ছিল যে একটা বিপুল সৃজন-প্রতিভা তাহাতে যখন ভাটা ধরিয়াছে তখনই বলি আসিয়াছে অবনতির যুগ। সেই সৃজন-প্রতিভাকে যদি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে আমরা চাই, তবে তাহাকে দেখিতে হইবে তাহার ভরা জোয়ারের যুগে। ভারতের নবজন্ম অর্থ, আবার সেই জোয়ারের আবির্ভাব, সেই জোয়ারের প্রাণ যাহা ছিল—রূপ হয় ত সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইতে পারে—তাহারই পুনর্বিকাশ। সুতরাং ভারতের নবজন্মের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিচার করিয়া দেখিতে হইলে, কি সব শক্তি তাহার ফুটিবে, কতদূর তাহার প্রসার হইবে, তাহা খোঁজ করিতে হইলে আমাদিগকে এই চলিত ধারণাটি ভুলিয়া যাইতে হইবে যে, বিষয়-বিমুখ পরত্র-মুখী দার্শনিক তত্ত্ববিচারই ছিল ভারতের জীবনের একমাত্র সুর এবং ইহারই মধ্যে ভারতের সব সৃষ্টির সব ছন্দ ডুবিয়া তলাইয়া গিয়াছে। তাহা নহে, ভারতের জীবনের মূল সুর দিয়াছে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি—আর সে সুর মোটেও একটানা একঘেয়ে নয়, রঙের রেখার

খেলায়,—রূপবৈদগ্ধ্যে—তাহা বহু বিচিত্র, যেমন তাহা সহজে নানাদিকে নানাভাবে আপনাকে বিস্তৃত, প্রসারিত করিয়া দিয়াছে তেমনি আবার উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধে, উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠিয়া আপনার একাগ্র তীব্রতার পরিচয় দিয়াছে। অবশ্য এই আধ্যাত্মিকতার সুরটিই আর সকল সুর ছাপাইয়া উঠিয়াছে, এইটিই বহিয়াছে গোড়ায়, সদা সর্ব্বদা বারে বারে এইটিই আসিয়া দেখা দিয়াছে, আর যাহা কিছু তাহা দাঁড়াইয়াছে ইহাকেই ভিত্তি করিয়া। ভারতের গরিমার প্রথম যুগ ছিল এই রকম এক বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতার যুগ। জীবনের সত্য তখন সে এক মনে এক চিত্তে খুঁজিয়াছে, একটা সাক্ষাৎ-বুদ্ধি, অপরোক্ষ-দৃষ্টির সহায়ে—বাহিরের ও ভিতরের, স্থুল ও সূক্ষ্ম জগতের বিষয় একটা অন্তর্ম্মুখী অনুভবের ও জ্ঞানের ভিতর দিয়া উপলব্ধি করিয়াছে ও ব্যাখ্যা দিয়াছে। এই গোড়ার আরম্ভ তাহার উপর যে ছাপ দিয়া গিয়াছে, ভারত কোনদিনই তাহা হারায় নাই—বরং যুগের পর যুগে অধ্যাত্মজগতের নূতন নূতন উপলব্ধি, নূতন নূতন আবিষ্কার দিয়া দেশের জীবনধারা তাহাকে সমৃদ্ধ, উপচিত করিয়াই চলিয়াছে। অবনতির যুগেও ভারত সব হারাইয়া বসিয়াছিল, কেবল এই জিনিষটি হারাইতে পারে নাই।

কিন্তু এই যে আধ্যাত্মিক ঝোঁক, তাহা শুধু উপরের দিকে, বস্তুকে বিসর্জ্জন দিতে দিতে কেবল সূক্ষ্ম তত্ত্বের দিকে, যাহা গুপ্ত যাহাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না, কেবল তাহারই দিকে যে উঠিয়া চলে এমন নয়। এই আধ্যাত্মিকতাই আবার নীচের দিকে, বাহিরে চারি-পাশে আপনার আলো ছড়াইয়া দেয়, চিন্তাজগতের সকল বহুল বৈচিত্র্য, জীবনের সকল বিপুল ঐশ্বর্য্যই, আলিঙ্গন করিয়া ধরে। তাই ভারতের গরিমার যে দ্বিতীয় যুগ, তখন আসিয়া দেখা দিল বিচারবুদ্ধি, নৈতিক আদর্শ, আধ্যাত্মিক সত্যের দীপ্তিতে জীবনকে গঠিত নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য জ্ঞানপ্রবুদ্ধ প্রচণ্ড কর্ম্মৈষণা। আত্মজ্ঞানের যুগের পর আসিল ধর্ম্মের যুগ, বেদ ও উপনিষদের পরে আসিল কর্ম্মের সৃষ্টির যুগ; ভারত তখন বীরবিক্রমে তাহার সমাজ-প্রতিষ্ঠান, তাহার চিন্তার আয়তন, তাহার দর্শনকে ঢালিয়া পিটিয়া তাহাদের মূল রূপ সব গড়িয়া তুলিতে সুরু করিল। ভারতের জীবনধারা ভারতের শিক্ষাদীক্ষার যে বাহিরের কাঠাম, তাহার মোটামুটি আকার এই যুগেই চিরকালের জন্য স্থিরীকৃত হইল, ভবিষ্যতে যে সব নূতন সৃষ্টি হইবে তাহারও বীজ এই যুগেই উপ্ত হইল। এই

সতেজ চিন্তাবৃত্তির খেলা যখন ক্রমে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সমাজনীতি, রাজনীতি সমস্ত প্রাকৃত জীবনেরই ব্যাপার ধরিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খের সূক্ষ্ম অনুসন্ধিৎসায় বিকশিত মুঞ্জরিত হইয়া উঠিল তখনই এই যুগের পূর্ণ পরিণতি, তখনই আসিল, যাহাকে পাশ্চাত্যেরা বলিয়া থাকেন সংস্কৃত শিক্ষাদীক্ষার 'ক্লাসিকাল্' যুগ। এই যুগেই হইয়াছিল সৌন্দর্য্যবোধের চরম বিকাশ,—সকল রকম চিত্তাবেগের, ইন্দ্রিয়ানুভবের—কেবল তাই নয়, ভোগের ও ইন্দ্রিয়পরতার রহস্যও ভারত এই যুগেই খুঁজিয়া খুঁড়িয়া দেখিয়াছিল। কিন্তু প্রাণের ও মনের এই বিপুল ক্রিয়াশীলতার পিছনে সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল ভারতের প্রাচীন অধ্যাত্ম-বোধ। তাই দেখি, এই যুগের শেষভাগে ভারতের সাধনা হইয়াছিল সমস্ত নিম্নপ্রকৃতিকে উপরে তুলিয়া ধরিতে, অধ্যাত্মের প্রভায় তাহাকে মণ্ডিত করিতে। পুরাণের, তন্ত্রের, ভক্তিমার্গের যে সাধনা, তাহার অর্থই এই। এই ভাবই পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠিল ভারত-প্রতিভার অন্তিম দীপ্তি উত্তরকালের বৈষ্ণব সাধনায়। বৈষ্ণব সাধনা চেষ্টা করিয়াছিল, মানুষের মধ্যে আছে যে রসানুভূতির, চিত্তাবেগের, ইন্দ্রিয়গত লিপ্সার স্তর, তাহাকে তুলিয়া

ধরিয়া অধ্যাত্মের সেবায় নিয়োগ করিতে। যে দৃষ্টি দিয়া ভারত তাহার জীবনযাত্রা স্থরু করিয়াছিল, এই রকমে ঘুরিয়া আবার সেইখানেই আসিয়া পৌছিল।

এই পূর্ণ পরিক্রমার পরে হইতে আরম্ভ ভারতের অবনতির যুগ। সে অবনতির সূচনা হইল তিনটি লক্ষণ দিয়া। প্রথমতঃ, ভারতের ছিল যে প্রচুর পরিপ্লাবী প্রাণশক্তি তাহার প্রবাহ স্তিমিত হইয়া আসিল, ছিল যে জীবনের আনন্দ, সৃজনের আনন্দ, তাহাতেও মলিনতা ধরিল। তবুও অধঃপতনের মধ্যেও ভারত যে সামর্থ্য দেখাইয়াছে তাহা বাস্তবিকই অদ্ভুত ও আশ্চর্য্যজনক। খুব অল্প সময়ের জন্যই সে সামর্থ্যটুকুও চলিয়া গিয়া প্রায় দেখা দিয়াছিল তামসিকতার পূর্ণগ্রাস। কিন্তু তাহা হইলেও অতীতের বিরাট্ মহত্ত্বের সহিত তুলনা করিলে স্পষ্টই বোধ হইবে কি রকমে ভারত ক্রমাগতই অধঃপতনের দিকে অব্যর্থভাবে চলিয়া আসিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ভারত হারাইল তাহার পুরাতন যুগের স্বাধীন চিন্তাবৃত্তির অবাধ খেলা—তাহার সজাগ সত্যজিজ্ঞাসা, তাহার তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি মলিন হইয়া আসিল, মলিন হইয়া আসিল তাহার সৃষ্টি-ক্ষম দৃষ্টি। যাহা রহিল তাহা ক্রমেই পুরাতন জ্ঞানের

অবোধ চর্ব্বিতচর্ব্বনে পর্য্যবসিত হইয়া চলিল। অতীতের সজীব বুদ্ধি যে সজীব রূপ সব সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহারই ভগ্নাবশেষের মধ্যে ভারতের জীবনমন নিথর জড়ত্ব পাইয়া বসিল। শাস্ত্রের প্রমাণের যে মর্ম্ম, যে অর্থ, তাহা লোপ পাইল, সেখানে দেখা দিল শুষ্ক বিধিনিষেধের অকাট্য আদেশ। আদেশের পিছনে যেখানে প্রাণের অভাব, সেখানে আদেশ হইবে যে অত্যাচার তাহা ত স্বাভাবিক। পরিশেষে, আধ্যাত্মিকতাও কায়ক্লেশে বাঁচিয়া থাকিল বটে, কিন্তু তাহাতে রহিল না প্রাচীন যুগের সে বৃহৎ, সে উজ্জ্বল জ্ঞানতেজ; এখানে ওখানে সময়ে সময়ে বিক্ষিপ্তভাবে তাহার তীক্ষ্ণ তীব্রধারা ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহাতে পাই না পুরাতনের সে বিশাল সমন্বয়ের ভাব; তাহাতে দেখা দিল একদেশদর্শিতা, অন্য সকল সত্যকে ঠেলিয়া ফেলিয়া একটিমাত্র সত্যকেই একান্তভাবে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিবার অন্ধ প্রয়াস।

এই যে চারিদিকে ক্ষয় ধরিল, তাহার ফলে ভারত তাহার সমস্ত শিক্ষাসাধনার লক্ষ্যটি হইতে এক রকম ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। বাহ্যজীবনের, মনোবুদ্ধির ক্ষেত্রকে পর্য্যন্ত পূর্ণ আধ্যাত্মিক রূপে রূপান্তরিত করিয়া ভারত

চলিতেছিল, সে পথে আর অগ্রসর হওয়া তাহার হইল না। যে ভাবে সে আরম্ভ করিয়াছিল তাহা অপূর্ব্ব, অতুলনীয়, যে বিকাশের ধারায় চলিয়াছিল তাহাও অপরূপ কিন্তু ঠিক যেখানে সুরু হওয়া উচিত ছিল, পূর্ণতা, পরিণতি, নূতন সমন্বয়, নূতন উন্মেষ—ফলের আবির্ভাব, সেই সন্ধি-মুহূর্ত্তেই প্রাচীন দীক্ষার প্রেরণা হঠাৎ থামিয়া গেল—ভারত চলিল কতক যেন পিছনে হটিয়া, কতক যেন পথ হারাইয়া। তবে এ কথা সত্য, আসল বস্তু ছিল যাহা, তাহা একেবারেই নষ্ট হইতে ভারত দেয় নাই—শুধু স্মৃতি, অন্ধ অভ্যাসের আচারের মধ্যেই নয়, কিন্তু দেশের প্রাণের মধ্যেই তাহা বর্ত্তিয়া রহিল ও এখনও রহিয়াছে। কিন্তু ভিতরের সেই বস্তুর প্রকাশের পথ নানা জালজঞ্জালে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল—তাহার ক্রিয়ায় দেখা দিল নানা বিকৃতি। এই রকম অবস্থা হইল কেন, অন্তরের ও বাহিরের কোন্ কারণ-পরম্পরায়, সে কথা এখন আমরা বিচার করিব না। যে কারণেই হউক, অবস্থা দাঁড়াইল এই ; আর ইহারই দরুণ ঠিক এই সময়েই ভারতকে যে একটা অভিনব, অভূতপূর্ব্ব ঘটনাচক্রের সম্মুখীন হইতে হইল, তাহাতে দেখি ক্ষণকালের জন্য সে অসহায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াই পড়িল।

কারণ, এই সময়েই ভারতের উপর আসিয়া পড়িল ইউরোপের বন্যা। সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সম্পূর্ণ বিপরীত শিক্ষাদীক্ষার সহিত সংঘর্ষের প্রথম ফল হইল এই যে, প্রাচীন যাহা কিছুর আর বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া থাকিবার সামর্থ্য ছিল না তাহা অধিকাংশই ধ্বংস হইয়া গেল, অনেকানেক জিনিষ গলিয়া নূতনের কুক্ষিগত হইল ; বাকী যাহা রহিল তাহাদের জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া চলিল। সেই সাথে নূতন একটা কর্ম্মোদ্দীপনাও দেখা দিল বটে, কিন্তু প্রথম প্রথম তাহার লক্ষ্য হইল বিদেশী শিক্ষাদীক্ষার স্থূল বিশৃঙ্খল যেন তেন অনুকরণ। ভারতের পক্ষে সত্যই এ একটা ছিল দারুণ সঙ্কটের—ভীষণ অগ্নিপরীক্ষার মুহূর্ত্ত। তাহার প্রাণশক্তি যদি স্বভাবতঃই এতখানি প্রচুর ও সমর্থ না হইত, তবে একদিকে আপনকার পুরাতন আদর্শের মৃত ভার, আর একদিকে পরধর্ম্মের অন্ধ অনুকরণ, এই দুইদিকের চাপে সে প্রাণশক্তি যে নিষ্পিষ্ট হইয়া যাইত, লোপ পাইয়া বসিত, সেই সম্ভাবনাই ছিল বেশী। এই ধরণের অবস্থায় পড়িয়া এক একটা দেশ ও জাতি যে কি ভাবে উৎসন্ন যাইতে পারে, তাহার সাক্ষ্য ইতিহাসই দিয়াছে। কিন্তু ভারতের ভাগ্য, তাহার জীবনীশক্তি একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই ;

তাহা ছিল শুধু সুপ্ত—তাই ব্যাধির প্রতিকার সে পাইল নিজেরই ভিতরে। ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষার রূঢ় সংঘাতের ফলে তাহার জীবনে সাময়িকভাবে যতই পচ্ যতই ক্ষয় ধরুক না কেন, সেইখান হইতেই আসিল ভারতের তখন প্রয়োজন ছিল যে তিনটি প্রেরণা। প্রথমতঃ, সাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠিল তাহার সুপ্ত চিন্তাবৃত্তি, বিচারশক্তি। দ্বিতীয়তঃ, তাহার জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল, তাহার মধ্যে ফুটিল নূতন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। আর তৃতীয়তঃ, অভিনব সব অবস্থা ও আদর্শের সাক্ষাৎ সম্মুখে পড়িয়া ভারতের নবশক্তিকে তাহাদের সহিত বাধ্য হইয়া বুঝাপড়া করিতে হইল—তাহাদিগকে দেখিবার শুনিবার, জয় করিবার, আত্মসাৎ করিয়া লইবার একান্ত প্রয়োজন তাহার হইল। ভারত নূতন এক দৃষ্টিতে আপনার প্রাচীন শিক্ষাদীক্ষার দিকে চাহিল, তাহার অর্থ ফিরিয়া আবার সে হৃদয়ঙ্গম করিল, শুধু তাই নয়, আধুনিক জ্ঞানের আদর্শের সহিত তাহাকে মিলাইয়া দেখিতে লাগিল। এই নবোদ্ভিন্ন দৃষ্টি ও প্রেরণা হইতেই ভারতের আসিতেছে নবজন্ম, ইহাই নিয়ন্ত্রিত করিবে ভবিষ্যতের ধারা। এই নবজন্মের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কাজ ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিক

জ্ঞানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা—তেমনি গভীর, সমৃদ্ধ, অখণ্ডভাবে, সকল মহিমায় ভরিয়া দিয়া। দ্বিতীয় কাজ—এই আধ্যাত্মিকতাকে দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সকল রকম অনুসন্ধানেরই নূতন একটা রূপের মধ্যে প্রবাহিত করিয়া দেওয়া। আর তৃতীয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজ হইতেছে, ভারতের অন্তরাত্মার ধর্ম্ম যাহা, তাহাকে ধরিয়া, তাহারই সহায়ে সম্পূর্ণ নূতন ভাবে আধুনিক সকল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা, সমাজকে আধ্যাত্মিকতারই জাগ্রত বিগ্রহ করিয়া তুলিবার জন্য একটা বৃহত্তর সমন্বয়সূত্র আবিষ্কার করা। এই তিনটি ধারায় ভারতের নবজন্ম যে পরিমাণে সফলকাম হইবে, ঠিক সেই পরিমাণেই জগতের মানবজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে সে হইবে সহায়।

অধ্যাত্ম কাহাকে বলি? অধ্যাত্ম অর্থ আত্মায় প্রতিষ্ঠিত। অধ্যাত্ম হইতেছে বীজসত্য সব লইয়া রহিয়াছে উপরে যে অনন্ত; আর সেই সব বীজসত্যকে ধরিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে, পরিপূর্ণতার দিকে, সার্থকতার দিকে—নিজের নিজের সত্য অভিমুখে, চলিয়াছে নীচেরকার অনন্তের যে সব সম্ভাবনা তাহা লইয়াই অধিভূত বা জীবন। আমাদের বুদ্ধি, আমাদের ইচ্ছাশক্তি,

আমাদের কর্ত্তব্যবোধ, আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ—সবই এই দুই অনন্তের মধ্যে মধ্যস্থের বা দর্পণের কাজ করিতেছে। পাশ্চাত্য জীবনকেই অতিকায় করিয়া দেখিতে শিখিয়াছে, কিন্তু এই জীবনকে অনুপ্রাণিত শ্রীমণ্ডিত করিবার জন্য উপরের শক্তির আবাহন সে খুব অল্পই করিয়াছে। ভারতের পথ সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারত চাহিয়াছে আগে অধ্যাত্মকে—অন্তরে সত্য-পুরুষকে আবিষ্কার করিতে, উর্দ্ধতন শক্তিরাজির যত গহনতম ধারা তাহা ব্যক্ত করিয়া ধরিতে; ভারত জীবনের সামর্থ্য বাড়াইয়া তুলিতে চাহিয়াছে, সেইজন্য আগে চেষ্টা করিয়াছে জীবনকে কোন না কোন প্রকারে এমন বশীভূত করিতে, ইচ্ছামত এমন গড়িয়া পিটিয়া লইতে, যাহাতে সেখানে প্রতিফলিত প্রতিরণিত হইয়া উঠিতে পারে অধ্যাত্মেরই শক্তি। একদিকে সে সহজ বৃত্তিগুলিকে সহজভাবেই ফুটাইয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে, —বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি, কর্ত্তব্যবোধ, সৌন্দর্য্যবোধ, চিন্তাবেগ প্রভৃতি মানস-বৃত্তির মনের মধ্যেই কতদূর কি সম্ভাবনা তাহা তলাইয়া দেখিয়াছে; অন্যদিকে আবার এই সকল বৃত্তিকেই সে চেষ্টা করিয়াছে মনের উপরে তুলিয়া ধরিতে, বৃহত্তর জ্যোতির শক্তির দিকে ঘুরাইয়া

তাহাদের নিজেদেরই সমুচ্চ সত্য-প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত করিতে।

ভারতের নবজন্মের কাজ হইবে এই অধ্যাত্মশক্তিকে, এই সমুচ্চ দৃষ্টিকে, এই গভীর প্রতিভাকে জগতের জীবনক্ষেত্রে আবার একবার সজীব সৃজনক্ষম করিয়া ধরিতে, সকল শক্তির উপরে একচ্ছত্র শক্তিরূপে স্থাপন করিতে। কিন্তু নিজের নবজন্মের এই যে ভিতরের সত্য, সে সম্বন্ধে ভারত এখনও সম্পূর্ণ সচেতন হইয়া উঠিতে পারে নাই, অস্পষ্টভাবে অনুভব করিতেছে মাত্র। বর্ত্তমানে সে যাহা কিছু করিতেছে তাহার বেশীর ভাগই ইউরোপীয় ভাবে, ইউরোপীয় ভঙ্গীতে অনুপ্রাণিত। আমাদের অন্তর-পুরুষের সহিত তাহার মিল সামঞ্জস্য নাই বলিয়া, তাহা আমাদের গভীরতম সত্তা হইতে উৎসারিত হইতেছে না বলিয়াই সে কাজের প্রেরণার মধ্যে তীব্রতা নাই, গড়নের মধ্যে সামর্থ্য নাই, ফলও আশানুরূপ নহে। দুই একটি ক্ষেত্রে মাত্র একটা আত্মজ্ঞানের পরিষ্কার লক্ষণ যেন দেখিতে পাই। কিন্তু যতদিন এই আত্মজ্ঞানের জ্যোতিঃ সকল দিকে না ছড়াইয়া পড়িবে, সাধারণ হইয়া না পড়িবে ততদিন ভারতের নবজন্ম ভবিষ্যতের আশা রূপেই থাকিবে, বর্ত্তমানের বাস্তব বস্তু হইয়া উঠিবে না।

২

ভারতের নবজন্ম অবশ্যম্ভাবী। এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে, কি ধারায় এই পরিবর্ত্তনটি ঘটিতেছে, এই একটা জটিল ভাঙন ও পুনর্গঠনের কাজ চলিতেছে। অবশ্য শেষ ফল, পূর্ণ পরিণতি এখনও দূরে ভবিষ্যতের গর্ভে, তবে গোড়ার বনিয়াদ সব ইতিমধ্যেই হয় ত গাঁথা হইয়া গিয়াছে। কোন্ পথে চলিয়া প্রাচীন একটা শিক্ষাদীক্ষা রূপান্তরিত হইয়া নবযুগে পাইতেছে নব-প্রতিষ্ঠা? কারণ এ কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে, এখানে নবজাত একটা শিক্ষাদীক্ষা পুরাতন মৃত শিক্ষাদীক্ষার সহিত আপনাকে মিলাইয়া ধরিতেছে না—ভারতের নবজন্ম অর্থ সত্য সত্যই নূতন জন্ম অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম। ভারতের এই পুনর্জ্জন্মের ধারা যদি বিশ্লেষণ করি তবে দেখিতে পাই, কার্য্যকারণপরম্পরায় এবং ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরায়ও সেখানে রহিয়াছে তিনটি ধাপ। প্রথম ধাপ হইতেছে ইউরোপের সংস্পর্শে আসিয়া দাঁড়ান—ফল, পুরাতন শিক্ষাদীক্ষার অনেক প্রধান অঙ্গই আবার নূতন করিয়া যাচাই করিয়া দেখা, আর এমন কি, তাহার কতকগুলি মূল তত্ত্বকেই একেবারে বিসর্জ্জন দেওয়া।

দ্বিতীয় ধাপ হইতেছে, ইউরোপীয় প্রভাবের বিরুদ্ধে ভারতীয় ভাবের প্রতিক্রিয়া—ফল, ইউরোপ যাহা কিছু দিতে চাহিয়াছিল তাহা এক রকম সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা আর দেশের অতীতের প্রধান অপ্রধান সব বিষয়েরই উপর অতিমাত্র জোর দেওয়া। অবশ্য এই প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও গোপনে চলিয়াছিল বাহিরের প্রভাবকে আত্মবশ করিয়া, আত্মসাৎ করিয়া লইবার একটা চেষ্টা। আর তৃতীয় ধাপটি সুরু হইতে চলিয়াছে বা সবে সুরু হইয়াছে মাত্র। এটি নূতন সৃষ্টির যুগ। এই নূতন সৃষ্টিতে ভারতের অধ্যাত্মশক্তি আবার সকলের উপর স্থান লইয়াছে, আবিষ্কার করিতেছে আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপলব্ধ সত্য সব, আধুনিক ভাবের মধ্যে, রূপের মধ্যে যাহা প্রয়োজনীয়, যাহা অপরিহার্য্য, যাহা সত্য, যাহা সুস্থ দেখিতেছে তাহাই গ্রহণ করিতেছে কিন্তু সে সব এমন-ভাবে আত্মসাৎ করিয়া রূপান্তরিত করিয়া লইতেছে, নিজের স্বভাবের মধ্যে এমনভাবে একীভূত করিয়া ফেলিতেছে যে, তাহাদের বিদেশীয় প্রকৃতি লোপ পাইয়া যাইতেছে, তাহারা হইয়া উঠিতেছে 'পুরাণী দেবী' ভারত-শক্তিরই নিজস্ব লীলায়িত প্রতিভা—স্পষ্টই সেখানে আমরা দেখি, ভারত আধুনিক প্রভাব সব অমিতবলে

অধিকার করিয়া গ্রাস করিয়া চলিয়াছে, আধুনিকের প্রভাব আর ভারতকে অধিকার করিতে গ্রাস করিতে পারিতেছে না।

বিশ্ব-প্রকৃতির যে বহুল কর্ম্মধারা মানুষকে লইয়াই হউক, আর জড়বস্তু লইয়াই হউক, তাহার মধ্যে কোথাও অকস্মাৎ, বিনা কারণে কিছু ঘটিয়া যায় না, অথবা বাহিরের অবস্থাই সেখানে একমাত্র নিয়ন্তা নহে। পরিবর্ত্তনের ধারা যত বিপুল হউক না কেন, তাহার মূল আবেগ আসিতেছে বস্তুর অন্তরের প্রকৃতি হইতে। ভিতরে ভিতরে যে জিনিষ যাহা তাহারই চাপে কর্ম্মক্ষেত্রে সে অভিনব অপ্রত্যাশিত মূর্ত্তি সব লইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। ভারতের আছে যে অন্তরের সনাতনী প্রকৃতি, ভারত ভিতরে ভিতরে নিজে যাহা তাহারই দরুণ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে, পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে, বর্ত্তমানের এই যুগান্তর, জটিল রূপান্তর। ভারত যে রাতারাতি এক নিঃশ্বাসে পাশ্চাত্যের ভাব ও রূপ সব গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিবে, নিজের অতীতের যে সব অধিষ্ঠাত্রী ভাব সেগুলি বিসর্জ্জন দিয়া, সব্যাজে যেন তেন প্রকারেণ বিদেশীর আবহাওয়ায় আপনাকে মিলাইয়া ধরিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িবে—ইহা এক অসম্ভব

ব্যাপার। অবশ্য এই রকম একটা ত্বরিত পরিবর্ত্তনের ফলেই আধুনিক জাপান জন্ম লইয়াছে; কিন্তু জাপানের মত যদিই-বা ভারত বাহ্যিক অবস্থার আনুকূল্য পাইত তবুও ভারতে সে ভাবের কিছু কখন ঘটিতে পারিত না। কারণ, জাপান জীবন যাপন করিতেছে তাহার চিত্তের যে বিশেষ গড়ন বা মেজাজ, তাহার যে রঞ্জিনী-বৃত্তি বা সৌন্দর্য্যবোধ তাহাকেই মুখ্যতঃ কেন্দ্র করিয়া; জাপান চিরকালই পরের বস্তু কি ভাবে আপনার করিয়া লইতে হয় সে কৌশল অভ্যাস করিয়া আসিয়াছে। জাপানের আছে একটা ধাতুগত দৃঢ় নিষ্ঠা, তাহারই ফলে সে আপন জাতীয় বিশেষত্বকে অটুট রাখিতে পারিয়াছে; আর শিল্পীর যে সৌন্দর্য্যদৃষ্টি তাহারই শক্তিতে সে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে দেশের অন্তরাত্মাকে। কিন্তু ভারতের জীবন মুখ্যতঃ প্রতিষ্ঠিত তাহার অধ্যাত্ম-সত্তায়। ভারতের তুলনায় জাপানের প্রাণের আছে একটা উৎফুল্ল তরলতা, একটা সুলভ বেগপ্রবণতা। জাপানের মত ভারত এত সহজেই কর্ম্মের মধ্যে মত্ত হইয়া যাইতে, বাহিরের দিকে ছুটিয়া চলিতে পারে না, অল্পেতেই সাড়া দিয়া চেতিয়া উঠে না। তাই দেখি, অবস্থা অনুসারে আপনাকে পরিবর্ত্তন করিয়া

ধরিবার পটুতা তাহার অপেক্ষাকৃত কম; কিন্তু তাহার যাহা আছে, তাহা হইতেছে একটা গভীরতর, নিবিড়তর ধ্যানপ্রতিষ্ঠ স্থৈর্য্য। ভারত যে কাজ করে, তাহা করিতে সে চায় ধীরে সুস্থে বিচার বিবেচনা করিতে করিতে, ইতস্ততঃ করিতে করিতে। তাহার কাজ সময় সাপেক্ষ; কারণ, জিনিষকে সে আগে লইয়া চলে নিজের গভীরত্বে এবং অন্তরের এই অন্তরতম প্রদেশ—এই 'গুহাগতং গহ্বরেষ্ঠং'—হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে তবে বাহিরের জীবনের যেখানে যাহা পরিবর্ত্তন করিবার, পুনর্গঠন করিবার, তাহা সে করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাহিরের দেওয়া জিনিষকে লইয়া সে এই ভাবে আপনার মধ্যে না ডুবিয়া যাইতে পারিয়াছে, তাহাকে নিজের অন্তর্ভূক্ত, অঙ্গীভূত না করিয়া লইতে পারিয়াছে, যে শক্তি জিনিষকে আবার নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবে, তাহা যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভিতরে ভিতরে সে প্রস্তুত না করিয়া ধরিতে পারিয়াছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যে নূতন পথ সে ধরিয়াছে, তাহাতে স্বচ্ছন্দগতিতে অগ্রসর হইয়া চলিতে পারিবে না। ভারতের নবযাত্রা বহুমুখী, জটিল; এই জন্যেই যে সব সমস্যা তাহার সম্মুখে উঠিতেছে তাহাদের মীমাংসা এমন দুরূহ।

যতই সে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, ততই এত রকমের মতবাদ, দেখিবার ভঙ্গী, চলিবার ধারা, সব ফুটিয়া উঠিয়াছে মিশামিশি হইয়া এমন বিরাট্ গোলমাল পাকাইয়া তুলিয়াছে যে সেখানে কোন স্পষ্ট নিঃসন্দেহ পরিণতি সহজে সম্ভব হইতেছে না—মনে হয় যেন আমরা চলিয়াছি অন্ধকারের মধ্য দিয়া অনির্দ্দিষ্ট ঘটনা-চক্রের তাড়নায়, ভবিষ্যতের লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার ধারণা কিছু নাই, ঢেউএর মত একটা আবেগে এক সময়ে উঠিয়া পড়িতেছি, আবার আর এক খেয়ালে পরমুহূর্ত্তে নামিয়া পড়িতেছি—আমরা চলিয়াছি এই ভাবে ভাসিয়া ভাসিয়া। তবুও একথা সত্য যে, এই সকল অনিশ্চয়তার অন্তরালে ভিতরে ভিতরে একটা লক্ষ্য নির্ণীত হইয়া উঠিতেছে, তাহার অভিব্যঞ্জনা বাহিরেও আসিয়া দেখা দিতেছে। ফল তাহার আর যাহাই হউক, সে জিনিষ যে পাশ্চাত্য আধুনিকতার প্রাচ্য সংস্করণ নহে, সে জিনিষ যে সম্পূর্ণ নূতন একটা সৃষ্টি, সমস্ত মানবজাতির ভবিষ্যৎ শিক্ষাদীক্ষা যে তাহার উপর অনেকখানি নির্ভর করিবে, এইটুকু এখনই নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

পাশ্চাত্যশিক্ষার ফলে ভারতে সর্ব্বপ্রথম যাঁহাদের মস্তিষ্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল—সংখ্যায় তাঁহারা সামান্য

হইলেও, প্রতিভায় ও সৃজন-সামর্থ্যে তাঁহারা ছিলেন বিশেষ শক্তিমান্—তাঁহাদের কিন্তু মনের ভাব এ রকমের ছিল না। তাঁহারা আশায় আশায় ছিলেন যে, তাড়াতাড়ি একটা পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে—পরে জাপান অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সহিত যাহা করিতে পারিয়াছিল, সেই ধরণের কিছু। নবীন ভারত মনে, প্রাণে, অন্তরাত্মায়, সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণরূপে আধুনিক হইয়া উঠিবে—ইহাই ছিল তাঁহাদের পরম আকাঙ্ক্ষা। তীব্র স্বদেশপ্রেমে তাঁহারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চিন্তার ভঙ্গী ছিল বিজাতীয়। আমাদের প্রাচীন শিক্ষাদীক্ষা শুধু অর্দ্ধ-সভ্যতার পরিচয়—পাশ্চাত্যের এই অভিমত তাঁহারা স্পষ্ট কথায় না হউক, কার্য্যতঃ মানিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদের মূল আদর্শ সব পাশ্চাত্য হইতে গৃহীত, যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় তাঁহারা গঠিত হইয়াছিলেন তাহারই ভাবে, ভঙ্গীতে, ধরণধারণে অনুপ্রাণিত। মধ্যযুগের ভারত হইতে তাঁহারা বিদ্রোহ-ভরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—তখনকার যাহা কিছু সৃষ্টি, সে সকলকে ধ্বংস করিতে, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন; সেখান হইতে যদিই বা কখন কিছু গ্রহণ করিতেন, তবে কেবল কবিত্বময় অলঙ্কার হিসাবে,

অথবা তাহাদের একটা বাহ্যিক, আধুনিক অর্থ করিয়া দিয়া। প্রাচীন ভারতের প্রতি তবুও তাঁহারা গর্ব্বভরে চক্ষু ফিরাইয়া ধরিয়াছিলেন—সব দিকে না হউক, অন্ততঃ কোন কোন দিকে। তাঁহাদের নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে যাহাই মিলাইয়া ধরিতে পারিয়াছেন, প্রাচীনের তাহাই সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এই ভাবে কোন জিনিষেরই মূল অর্থ, সত্যকার ব্যঞ্জনার মধ্যে প্রবেশ করিতে তাঁহারা পারেন নাই, তাঁহাদের পাশ্চাত্য মস্তিষ্কের সাথে যে বস্তুর সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে অপারগ্ হইয়াছেন, তাহাকেই কাটিয়া ছাঁটিয়া ফেলিয়া দিতে চাহিয়াছেন। ধর্ম্মকে তাঁহারা যতদূর পারেন, বুদ্ধিবিচারের মাপকাঠি দিয়া সহজ সাদামাঠা যুক্তিবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন; যে সাহিত্য তাঁহারা সৃষ্টি করিলেন, তাহার মধ্যে ইংরাজীর হাবভাব, তাঁহাদের ইংরাজী আদর্শের সমস্ত প্রাণই দুইহাতে আমদানী করিতে লাগিলেন—অবশ্য আর সকল শিল্পকলার দিকে ফিরিয়াও নজর দিলেন না। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তাঁহাদের আশা ও ভরসা হইল ইংরাজের অনুসরণ করা বা হুবহু অনুকরণ করা অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে ছিল যে মধ্যবিত্তদের কর্ত্তৃত্বাধীন একটা ভুয়ো-গণতন্ত্র, তাহাকে সাঙ্গোপাঙ্গ

তুলিয়া আনিয়া ভারতে স্থাপন করা। সমাজকেও তাঁহারা ঢালিয়া আবার সাজিতে চাহিয়াছিলেন ইউ-রোপের সামাজিক আদর্শ, ইউরোপীয় সমাজের গড়ন অনুসারে। এই রকম অন্ধ শ্রদ্ধাবশে তাঁহারা যে যে জিনিষ আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে তাহাদের কোন কোনটির সার্থকতা কিছু থাকিলেও হয়ত থাকিয়া যাইতে পারে; কিন্তু যে উপায় বা পথ তাঁহারা লইয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ ভুল, এ কথা আজ আমরা স্বীকার করিতেছি। ইংরাজী ভারতবর্ষ যে কখনও সম্ভব বা বাঞ্ছনীয়, তাহা আমরা আর মনেও করিতে পারি না। ফলতঃ, ভারতবর্ষকে যদি সত্য সত্যই ইংরাজী ভাবাপন্ন করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতাম, তবে আমরা হইয়া পড়িতাম—বড়জোর দীন নকলনবীশ, হীন অনুচর;—দেখিতাম ইউরোপের পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে আমরা প্রতিপদে হোঁচট্ খাইয়া পড়িয়া যাইতেছি আর চিরদিনই অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর পিছনে রহিয়া গিয়াছি। পাশ্চাত্য প্রভাবান্বিত সে মনের ধারা বেশী দিন ভারতে ছিল না, থাকা সম্ভব ছিল না। আজকাল এখানে ওখানে তাহার দুই একটা নিদর্শন দেখা গেলেও যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রাণের স্পন্দন নাই,

তাহাকে সজীব, সমর্থ করিয়া তোলা দুঃসাধ্য নয়, অসাধ্য।

তবুও, সকল সত্ত্বেও, এই স্থূল অনুকরণের যুগও একেবারে বিফলে যায় নাই। এমন কতকগুলি জিনিষ সে স্বষ্টি করিয়া দিয়াছিল, যাহা না হইলে ভারতের নবজীবন কখন শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারিত না। সে সকলের মধ্যে সব চেয়ে প্রধান যে তিনটি, তাহাদেরই কথা এখানে আমরা বলিব। প্রথমতঃ, ভারতে আবার জাগিয়াছে মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তির অবাধ খেলা। প্রথম প্রথম এই বৃত্তিটি খুব সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, বেশীর ভাগ পরের প্রতিধ্বনি করিয়াই চলিত বটে; কিন্তু ক্রমে তাহা দেশের সহিত, মানবজাতির সহিত যে বিষয়ের কিছু সম্পর্ক আছে, তৎসমুদয়ের উপরই আপনাকে ছড়াইয়া দিতেছে, যতই দিন যাইতেছে ততই দেখিতেছি তাহার অনুসন্ধিৎসা বাড়িয়া যাইতেছে, যে ক্ষেত্র ধরিতেছে সেই ক্ষেত্রেই তাহার নিজস্বতা উত্তরোত্তর ফুটাইয়া তুলিতেছে। প্রাচীন ভারতের ছিল যে সকল প্রকার জ্ঞানের জন্য একটা অশ্রান্ত আকাঙ্ক্ষা, তাহাই যেন আবার ফিরিয়া আসিতেছে; সেই জ্ঞানে আস্তে আস্তে প্রাচীনকালেরই প্রসারতা, গভীরতা,

কার্য্যপটুতা যে ফুটিয়া উঠিবে, তাহাও সন্দেহ করিবার নহে। ভারতের বুদ্ধির মধ্যে দেখা দিয়াছে একটা নিরঙ্কুশ বিচারশক্তি, পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণক্ষমতা, সংস্কারমুক্ত হইয়া সত্যসিদ্ধান্তে পৌঁছিবার দৃঢ়তা—মস্তিষ্কের এই কয়টি গুণ পূর্ব্বকালে মুষ্টিমেয় জ্ঞানীর মধ্যে ও সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহারা হইয়া পড়িয়াছে সাধারণ হিসাবে বুদ্ধিবৃত্তির অনিবার্য্য অঙ্গ। অনুকরণের যুগে অবশ্য এই সকল ধারা ভারত বেশীদূর লইয়া যাইতে পারে নাই, কিন্তু বীজ তখনই বপন করা হইয়াছিল; সেই বীজ ফলে ফুলে কি রকমে মুঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে তাহা দেখিতেছি আজ আমরা। দ্বিতীয়তঃ, এই যুগে আধুনিক ভাব চিন্তা সব আমাদের প্রাচীন শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া আমাদের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীকে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে—তাই কেবল গতানুগতিক সংস্কারের মাপকাঠিতে আধুনিক ভাব-চিন্তাকে বিচার না করিয়া, সম্পূর্ণ নূতন রকমে সেগুলিকে দেখাশুনা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। সকলের শেষে, আমাদের প্রাচীন সম্পদের প্রতিও আমরা দিতে পারিতেছি একটা অভিনব দৃষ্টি এবং ইহারই কল্যাণে আমরা উদ্ধার করিতে পারিতেছি এতদিনকার অন্ধ

অথর্ব্ব অনুষ্ঠানাদির মধ্যে গুপ্ত লুপ্ত হইয়া ছিল প্রাচীনের যে অর্থ যে প্রাণ ; শুধু তাই নয়, এই নূতন দৃষ্টির সহায়েই আমরা প্রাচীন সত্যের ভিতর হইতে খুলিয়া ধরিতে পারিতেছি নূতন নূতন রূপ, নূতন নূতন অভিব্যঞ্জনা —আমরা আবিষ্কার করিতেছি নবতর সৃষ্টির, নবতর রূপান্তরের সম্ভাবনা। এই প্রথম যুগে আমাদের প্রাচীন শিক্ষাদীক্ষাকে আমরা ভুল বুঝিয়াছি—কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমরা জিনিষকে যে ফিরিয়া নূতন করিয়া দেখিতে শিখিয়াছি, এমন কি, গোঁড়া প্রাচীনপন্থী যে মন, তাহাকেও বাধ্য হইয়া এই শিক্ষা যে গ্রহণ করিতে হইয়াছে—ইহাই হইতেছে সকলের চেয়ে বড় কথা।

অনুকরণের যুগের পর প্রতিক্রিয়ার যুগ। এই দ্বিতীয় যুগে ভারত ঘরমুখী হইয়াছে, চলিয়াছে নিজের জাতীয় সত্তার বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করিতে করিতে—লাভ করিয়াছে ধর্ম্মের ও কর্ম্মের গভীরতর সত্যতর ইঙ্গিত প্রেরণা সব। প্রথমতঃ, ইংরাজীয়ানার স্রোতের মুখে অনতিবিলম্বেই আসিয়া দেখা দিল ভারতের প্রাচীন প্রাণ এবং ইহারই রঙে ক্রমশঃ সে ইংরাজীয়ানা নিবিড়ভাবে রঙিয়া উঠিতে লাগিল। আজকাল আধুনিক-শিক্ষিত

যাঁহারা এখনও জোর করিয়া পাশ্চাত্যের ভাবে অভিভূত হইয়া আছেন তাঁহারা সংখ্যায় অতি অল্প এবং দিন দিনই কমিয়া আসিতেছেন। আর ইঁহারাও, এক সময়ে যে সাধারণ রীতিই একটা হইয়া উঠিয়াছিল প্রাচীনকে মুক্তকণ্ঠে তারস্বরে গালাগালি দেওয়া, সেই রকম কিছু করেন না। আধুনিক-শিক্ষিতদের মধ্যে বেশীর ভাগেরই ভাব বদ্‌লাইয়াছে আস্তে আস্তে, তাঁহাদের আধুনিকতা ক্রমশঃ ভরিয়া উঠিয়াছে প্রাচীনের ভাবে, অনুভবে, উত্তরোত্তর তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়া চলিয়াছেন ভারতীয় জিনিষের যে বিশেষ ধরণধারণ, তাহার অর্থ কি—প্রাচীনের রূপ অপেক্ষা ভাবকে মোটামুটি গ্রহণ করিয়া তাঁহারা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন একটা নূতন ব্যাখ্যা। প্রথম প্রথম আমরা যে অর্থ করিয়াছি, তাহার মূল কথাটি স্পষ্টই আধুনিক ছাঁচে ঢালা ছিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গে পাশ্চাত্যের অনুপ্রেরণাই ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু আমাদের এই চিন্তাপ্রবাহ স্বেচ্ছায় সাগ্রহে আপনার মধ্যে বরণ করিয়া লইয়া চলিল প্রাচীনের চিন্তাপ্রবাহ সব এবং ক্রমে ক্রমে প্রাচীনের যে আসল সত্য ভাব তাহার দ্বারাই গাঢ় হইতে গাঢ়তর রঞ্জিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এই অনুরঞ্জনের পথে

শেষে আমরা এতদূর চলিয়া গিয়াছি, গোড়ায় যে চিন্তা, যে ভাব দিয়া স্থরু করিয়াছি, পরে রঙ্ রেখা বদ্‌লাইতে বদ্‌লাইতে তাহা এমন রূপ লইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহা ভারতেরই একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে। এই রকমে যে রূপান্তর ঘটিয়াছে, তাহার ধাপ আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি দুই জনের সৃষ্টি দিয়া—ইদানীন্তন কালের সাহিত্যস্রষ্টাদের মধ্যে যে দুইজন প্রতিভার বিশেষত্বে ও নূতনত্বে সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান্—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাশ্চাত্যের সংস্পর্শজনিত এই যে পরিবর্ত্তনের ধারা, তাহার সাথে সাথেই আবার বিপরীত দিক্ হইতে একটি আরও বিশেষ ধরণের বলবত্তর ধারা বহিয়া চলিয়াছে। গোড়ায় এইটির আরম্ভ পূর্ণ বিদ্রোহ দিয়া—ভারতের যাহা কিছু, তাহা ঠিক যেমন আছে তেমনিই সে গ্রহণ করিয়াছে, জোর করিয়া সমর্থন করিয়াছে; আর কোন কারণের জন্য নহে, শুধু এই কারণে যে, তাহা ভারতের। এই ধাক্কার জের এখনও আমাদের মধ্যে পাওয়া যায়, এখনও ইহার অনেক প্রভাব সজীবভাবে বর্ত্তিয়া চলিয়াছে; কারণ, ইহার কাজ এখনও শেষ হয় নাই। কিন্তু এই যে প্রতিক্রিয়া, বাস্তবিক পক্ষে তাহা হইতেছে

একটা আরও সূক্ষ্ম সম্মিলনের একীকরণের আয়োজন। অতীতের জিনিষকে সর্ব্বতোভাবেও সমর্থন করিতে গিয়া আমরা বাধ্য হইয়া দেখিতেছি যে, সে কাজটি এমন ভাবে করিতে হইবে যাহাতে প্রাচীন ও নবীন মনোভাব, গতানুগতিক সংস্কার ও আধুনিক বিচারবৃত্তি দুইই একসাথে মিলিতে পারে,—যুগপৎ পায় চরিতার্থতা। ইহার ফলে আমরা কেবল আর অতীতে ফিরিয়াই চলিতে পারি না, জ্ঞানতঃ হউক, আর অজ্ঞানতঃ হউক, কাজে আমরা অনতিবিলম্বেই অতীতকে নূতনেরই সংজ্ঞায় ব্যক্ত করিতে থাকি। বস্তুতঃ, পরে এই অতীতের দিকে চলা, এই নিজের ঘরের অভিমুখে যে গতি, তাহার মধ্যে পাই একটা পূর্ণ সমন্বয়ের প্রয়াস। এই যুগে আমরা অতীত শিক্ষাদীক্ষার প্রাণটি চাহিয়াছি বটে, এমন কি, তাহার বাহিরের রূপ সবও অটুট রাখিতে, বাঁচাইয়া তুলিতে যত্নপর হইয়াছি; তবুও সেই সাথে যাহা একেবারে জীর্ণ শীর্ণ—তাহা ফেলিয়া দিতে বা নূতন করিয়া গড়িতে কুণ্ঠিত হই নাই,—শুধু তাই নয়, নূতন যাহা কিছু দৃষ্টিভঙ্গী পুরাতন অধ্যাত্ম-দৃষ্টির অঙ্গীভূত হইয়া যাইতে পারিয়াছে বা তাহার উদারতর গভীরতর পরিণতির পক্ষে সহায় হইয়াছে,

তাহাও অবলীলাক্রমে আমরা স্বীকার করিয়াছি। অতীত ও বর্ত্তমানকে এই রকমে মুক্তভাবে মিলাইয়া মিশাইয়া চলা, নূতন গড়ন দিয়া পুরাতনের রক্ষণ—এই আদর্শের শক্তিমান্ বিগ্রহ ছিলেন বিবেকানন্দ।

কিন্তু ইহাও শেষ কথা নয়—এখান হইতেই আবার আর একটা নূতন সৃষ্টির ধারার সূত্রপাত। অন্যথা, আমরা যে চিন্তার ও প্রেরণার যুগলধারার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার ফলে পাইতাম একটা বিসদৃশ মিশ্রণ—শরীরে যেমন আমরা আজকাল ধারণ করি ইউরোপীয় ও ভারতীয় পোষাকের একটা অপরূপ খিচুড়ী, মনের জগতে কতকটা হইত সেই রকম একটা বস্তু। ভারতকে অখণ্ডভাবে ফিরিয়া পাইতে হইবে তাহার অন্তরাত্মার গভীরতম প্রদেশে যে নৈসর্গিক শক্তি, বর্ত্তমানের প্রয়াস ভবিষ্যতের লক্ষ্য সব ধরিয়া দিতে হইবে ঐ অন্তরাত্মার শক্তির কাছে—এই শক্তিই জীবনের সকল প্রকাশকে যথাযথ ভাবে মিলাইয়া মিশাইয়া গড়িয়া পিটিয়া তুলিবে। এই ধরণের যে জীবন্ত, যে নিজস্ব সৃষ্টি হইতে পারে, তাহার বিশেষ একটা নিদর্শন আধুনিক ভারতের নব চিত্রকলা। এই নিজস্ব সৃষ্টির ধারা যখন আমাদের জাতীয় জীবনের

প্রত্যেক ক্ষেত্রে ফুটিয়া উঠিতে থাকিবে, তখনই নিঃসন্দেহে বুঝিব যে, ভারতের নবজন্ম পাইয়াছে অখণ্ড অটুট আত্মপ্রতিষ্ঠা।

৩

বর্ত্তমানে যত রকম প্রেরণা যত দিকে স্পষ্টভাবে, অস্পষ্টভাবে খেলিতেছে, সেই বিরাট বিশৃঙ্খলতা ভেদ করিয়া তাহার ভিতর হইতে ভবিষ্যতের নবসৃষ্টি ঠিক কি রূপ সব গ্রহণ করিবে তাহা নিরূপণ করিবার চেষ্টা বিশেষ উপকারে আসিবে কি না সন্দেহ। বাদ্যযন্ত্রের সুরবাঁধার শব্দ হইতে তবে কি রাগরাগিণী বাজান হইবে, তাহা আবিষ্কার করিবার প্রয়াসও করা যাইতে পারে। আমাদের জাতীয় জীবনে বর্ত্তমানে দুই একটা দিকে ছাড়া ভবিষ্যৎ রূপায়নের স্পষ্ট নির্দ্দেশ কোথাও দেখা দেয় নাই—এমন কি, এই দুই একটা দিকেও যে নির্দ্দেশ পাই, তাহা হইতেছে প্রথম ইঙ্গিত বা আভাস মাত্র; সেথানেও যতটুকু ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি তদপেক্ষা অনেক বেশীর ভাগই পিছনে অব্যক্ত রহিয়া গিয়াছে। ধর্ম্মে হউক, আর অধ্যাত্ম-সাধনায় হউক, চিন্তায় হউক, অনুভবে হউক, সাহিত্যে হউক, শিল্পকলায় হউক, সামাজিক ক্ষেত্রে হউক আর রাজনীতির ক্ষেত্রে হউক—সর্ব্বত্রই এই কথা প্রযোজ্য।

সর্ব্বত্রই যে জিনিষটি দেখি, তাহা হইতেছে সূচনার সূত্রপাত—আরম্ভের আরম্ভ।

তবে একটিমাত্র জিনিষ সম্বন্ধে বোধ হয় নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে। সেইটি এই যে, অতীতকালের মত ভবিষ্যতেও ভারতের জীবনে মুখ্য ও মূল সুর হইবে আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিকতা বলিতে আমরা কেবল সূক্ষ্ম তত্ত্বপরায়ণতা অথবা কাজ করিবার অপেক্ষা স্বপ্ন দেখিবার প্রবৃত্তি বুঝিতেছি না। এই অর্থে আধ্যাত্মিকতা কথাটি প্রাচীন ভারত তাহার পূর্ণ সামর্থ্যের গৌরবময় যুগে কখনও গ্রহণ করে নাই—ইউরোপের ও ইউরোপীয় ভাবে প্রভাবান্বিত একদল সমালোচক বিরুদ্ধে যতই কিছু বলুন না কেন—এবং ভবিষ্যতের ভারতও কখন তাহা গ্রহণ করিবে না। ভারতের মানসশক্তির মধ্যে তত্ত্বচিন্তা একটা প্রধান বৃত্তিই হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই, এবং এই ক্ষেত্রে তাহার যে সমস্ত সামর্থ্য ও প্রতিভা তাহা যেন কখন সে না হারায়, ইহাও বাঞ্ছনীয়। তবে ইউরোপ যাহাকে দার্শনিকতত্ত্ব (metaphysics) বলে অর্থাৎ জর্ম্মণ বা ফরাসী পণ্ডিতের মত চুল-চেরা চিন্তা সব বিনাইয়া বিনাইয়া বলা অথবা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের

মত স্থূল জগতের কয়েকটিমাত্র ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া তাহা হইতে সর্ব্বসাধারণ একটা দর্শনের (Philosophy) সূত্র বা নিয়ম নিষ্কাষণের চেষ্টা—এই দুইটির কোনটিই ভারতের তত্ত্ববিদ্যা বা দর্শনের স্বরূপ নয়। ভারতের দার্শনিক তত্ত্ব মূলতঃ চিরকালই ছিল বুদ্ধির সহায়ে অধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে গোচর করিবার, নিকটে আনিবার প্রয়াস। অবশ্য শেষাশেষি, এই দার্শনিক তত্ত্বপরায়ণতা জীবনের আয়তন হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু গোড়ায় তাহার প্রকৃতি এ রকমের ছিল না। আদিকালের বেদান্তে অর্থাৎ উপনিষদের সাক্ষাৎজ্ঞানলব্ধ যে তত্ত্ব, তাহাতে এই জিনিষটি পাই না এবং পরবর্ত্তী কালে যখন দেখা দিল চিন্তাবৃত্তির সজীব সমর্থ নূতন সৃষ্টির একটা যুগ, তখনও যেমন গীতার মধ্যে—সেই উপনিষদেরই মূলসিদ্ধান্ত অটুট্ রহিয়া গিয়াছে, দেখিতে পাই। বৌদ্ধদর্শনই সর্ব্বপ্রথম জীবনকে বাস্তবিক সন্দেহের চোখে দেখিতে আরম্ভ করে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম দার্শনিক সিদ্ধান্ত হিসাবেই জীবনকে অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিয়াছে—সাধনার, প্রয়োগের ক্ষেত্রে কার্য্যতঃ দেখি, সে জীবনকেই ধরিয়া চলিয়াছে, তাহাতে দিতে চাহিয়াছে শুধু একটা নূতন

রূপ, নূতন অর্থ। বৌদ্ধদের প্রবর্ত্তিত সদাচার ও আধ্যাত্মিক সাধনার প্রণালী মানুষের জীবনযাত্রায় একটা তপশ্চর্য্যার কঠোর সামর্থ্য আনিয়া দিয়াছিল, সেই সাথেই আবার মিশাইয়া দিয়াছিল একটা প্রীতির কোমলতর আদর্শ। এই জন্যই সমাজে, রাষ্ট্রে এবং জীবনের রহস্য ব্যক্ত করিয়া ধরিতেছে যে সব শিল্পকলা, তাহাতে বৌদ্ধযুগ এতখানি সৃষ্টিক্ষম হইয়া উঠিয়াছিল। অধ্যাত্মের সত্য নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করা এবং তাহারই সহায়ে জীবনকে সঞ্জীবিত, পুনর্গঠিত করা— ইহাই হইতেছে ভারতের প্রকৃতির সনাতন বৃত্তি। যখনই আসিয়াছে স্বাস্থ্যের, সামর্থ্যের মহত্ত্বের যুগ, তখনই ভারত যে এই বৃত্তিটির কাছে ফিরিয়া যাইবে, তাহা অনিবার্য্য।

ভারতের যত আন্দোলন জীবনকে ঢালিয়া গড়িতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির সূত্রপাত হইয়াছে দেখি একটা নূতন অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা দিয়া, প্রায়ই একটা নূতন ধর্ম্ম-প্রচেষ্টা দিয়া। বেশী দূর যাইতে হইবে কেন, এই যে সেদিনকার ইউরোপীয় ভাবের আক্রমণ, তাহা ছিল কতখানি তর্কপন্থী, যুক্তিবাদী, ধর্ম্মভাবের পক্ষে অপেক্ষা বিপক্ষেই সে চলিয়াছে বেশী; তাহার আদর্শ, অনুপ্রেরণা ছিল অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের

ইহসর্ব্বস্ব বহির্মুখী বুদ্ধি; অথচ ভারতবর্ষের উপর তাহার প্রথম ফল হইল ধর্ম্মসংস্কারের চেষ্টা, চেষ্টা শুধু কেন, কার্য্যতঃ কয়েকটি নূতন ধর্ম্মমতেরই সৃষ্টি। ভারতের এই বোধ একরকম নৈসর্গিক যে চিন্তাজগৎকে সমাজকে নূতন করিয়া গড়িতে হইলে আগে দরকার একটা আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠা ; ধর্ম্মের প্রেরণা ও ধর্ম্মের রূপায়ন দিয়াই তাহা আরম্ভ করিতে হইবে। ব্রাহ্ম-সমাজের পত্তন হয় একটা উদার বিশ্বজনীন্ ভাব লইয়া, যে সমন্বয়ের চেষ্টা সে করিয়াছে, তাহার জন্য উপকরণাদি সে সংগ্রহ করিয়াছে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ও জাতির ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাদীক্ষা হইতে। তাহার মূল অনুপ্রেরণা ছিল বৈদান্তিক, কিন্তু বাহ্য রূপের জন্য সে গিয়াছিল ইংলণ্ডের Unitarian (একেশ্বরবাদী) সম্প্রদায়ের নিকট বা এই ধর্ম্মমতের কতকটা ধরণধারণ, কতকটা খৃষ্টানী প্রভাব, অনেকখানি যুক্তিবাদ ও বুদ্ধিসর্ব্বস্বতা প্রভৃতি মিলিয়া মিশিয়া হইয়াছে ব্রাহ্মধর্ম্ম। কিন্তু এখানে যাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়, তাহা হইতেছে এই যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের সূত্রপাতই হয় বেদান্তকে ফিরিয়া নূতন ভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াসে। শুধু তাই নয়, দেশের সনাতন শিক্ষাসাধনার মধ্যে যাহাকে বলা যাইতে পারে

প্রতিবাদের ধারা, তাহাও কি রকমে সমষ্টিগত ধারারই আকৃতি প্রকৃতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে সেই রহস্যেরও আছে একটা বিশেষ অর্থ। ভারতের যে ধর্ম্মবৃত্তি তাহা চিরন্তন কাল হইতে তিনটি প্রেরণার উৎসকে ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম। ঠিক এই তিনটিকে ধরিয়া একের পর একে ব্রাহ্মধর্ম্ম ক্রমে তিনটি ভাগে শাখায়িত হইয়া উঠিয়াছে। তারপর পাঞ্জাবে যে আর্য্যসমাজ তাহার প্রতিষ্ঠা বেদের এক নূতন ব্যাখ্যার উপর, তাহার চেষ্টা হইতেছে বৈদিক সত্য সকল আধুনিক জগতের জীবনক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ ছিলেন যে ধর্ম্মান্দোলনের মাথায় তাহা চাহিয়াছে অতীত যুগের সকল ধর্ম্মসিদ্ধান্ত ও অধ্যাত্মউপলব্ধিকে একটা বিরাট্ উদার মহাসমন্বয়ে বিধৃত করা—সে সমন্বয় প্রাচীন বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসকে আবার সকলের উপরে স্থাপন করিয়াছে সত্য বটে, কিন্তু তাহারই সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছে নূতন জীবন্ত সাধনার ধারা, জনসেবার আগ্রহ, দেশে বিদেশে প্রচারের উৎসাহ। এমন কি, গোঁড়া যে হিন্দুধর্ম্ম, তাহারও গায়ে নূতন জাগরণের হাওয়া লাগিয়াছে—যদিও ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে সে জিনিষটির যেমন জোর ছিল, আজ ঠিক তেমন

নাই। ভারতের অন্যান্য ভাগও এই সকল বিপুল প্রাদেশিক আন্দোলনের ঢেউ কিছু কিছু অনুভব করিয়াছে, কোথাও বা নিজেরাই ছোট ছোট আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছে। বঙ্গদেশে ধর্ম্মভাবের সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক পরিণতি হইতেছে একটা নব বৈষ্ণবভাবের প্রসার; তাহাতে প্রমাণ হয়, যে-সব নব সৃষ্টির প্রয়াসের ভিতর দিয়া দেশ আপনাকে তৈয়ার করিয়া লইতেছে এখনও তাহাদের কাজ শেষ হয় নাই। সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়াই দেখি যাবতীয় পুরাতন ধর্ম্মসম্প্রদায় বা সাধন-পথ নূতন প্রাণে সমর্থ সজাগ হইয়া উঠিতেছে, ফিরিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যত্নপর হইয়াছে। ইস্‌লামও কিছু দিন হইল এই সর্ব্বত্রব্যাপী সাড়ায় যোগ দিয়াছে —ভারতের যে মুসলমান জনসাধারণ দীর্ঘকাল ধরিয়া তামসিকতার ঘোরে নিমজ্জিত ছিল তাহার মধ্যেও চেষ্টা চলিয়াছে ইস্‌লামের সনাতন আদর্শ আবার জীবন্ত করিয়া ধরিতে অথবা নূতন নূতন ভাবে আবার ঢালিয়া গড়িতে।

পুরাতনের জন্য এই যে সকল নূতন রূপ আবিষ্কৃত হইতেছে তাহার কোনটি তাই বলিয়া কিন্তু পাকা হইয়া উঠে নাই। এ সব প্রয়াসকেই পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে হইবে—ভারতের অধ্যাত্মবোধ কি রকমে

আস্তে আস্তে চারিদিক হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া জাগিয়া উঠিতেছে, অতীতের স্মৃতিকে উদ্ধার করিয়া ভবিষ্যতের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিতেছে, তাহারই নিদর্শন হিসাবে। ভারত হইতেছে সকল ধর্ম্মের মিলনক্ষেত্র। তাহাদের মধ্যে আবার এক হিন্দুধর্ম্মেরই কি বিশালতা, কি জটিলতা! বস্তুতঃ, হিন্দুধর্ম্ম একটা বিশেষ ধর্ম্ম নয়, তাহা হইতেছে বহুল বিবিধ অথচ অতি-সূক্ষ্ম একটা মিলনসূত্রে গ্রথিত অধ্যাত্মচিন্তার, উপলব্ধির, আদর্শের পুঞ্জ। এত সব ধারার এত রকমারি অনুপ্রেরণার যে চাঞ্চল্য, যে বিপুল হট্টগোল তাহার ভিতর হইতে কি বস্তু যে বাহির হইয়া আসিবে তাহা ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত। তবে যাহা হইয়াছে দেখিতে পা[redacted] তাহা এই—নূতন কর্ম্মের সৃষ্টির জন্য আমাদের আসিয়াছে একটা সত্যকার প্রেরণা, পুরাতন যে সব রূপায়ন তাহাদের মধ্যে আসিয়াছে একটা নূতন প্রাণ নূতন জীবন, প্রাচীন শিক্ষার সাধনার শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের চলিয়াছে পুনরালোচনা পুনঃপ্রতিষ্ঠা; দৃষ্টান্তস্বরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, বেদ বেদান্ত পুরাণ যোগ এবং কিছুদিন হইতে তন্ত্র পর্য্যন্ত আমাদের বুদ্ধিকে নাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে—যদিও একথা বলা যায়

না যে, আমরা সে সকলের পূর্ণ অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি বা বাস্তব জীবনে তাহাদের কিছু প্রয়োগ করিয়াছি,—ব্যবহারিক জগতে আমাদের চিন্তার মনোভাবের উপর তাহাদের বাস্তবিক ফল কিছু হইয়াছে। মোটের উপর দেখিতে পাইতেছি, আমরা যেন সত্যের বৃহৎ হইতে বৃহত্তর ক্রমবিকাশের পথে চলিয়াছি, প্রাচীন ভাবের চিন্তার নূতনতর উপলব্ধি অনুভূতির ভিতর দিয়া নব রূপসৃষ্টির দিকে অগ্রসর হইতেছি। শেষ পরিণতি যাহাই হউক না, নবীন ভারতের যে বিশেষত্বটুকু সকল জিনিষের উপরে আজ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতেছে এই আধ্যাত্মিকতার এই ধর্ম্মভাবের আলোড়ন বিলোড়ন। এই ক্ষেত্রেই স্পষ্ট দেখা দিয়াছে একটা সৃষ্টির, নূতন গঠনের সামর্থ্য; কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে, অন্ততঃ সে দিন পর্য্যন্ত, ভারত দেখাইয়া আসিয়াছে বেশীর ভাগ ভাঙ্গিবার বা সমালোচনা করিবার প্রেরণা। আর একটি বিশেষত্ব সকল প্রয়াসের মধ্যে আস্তে আস্তে জাগিয়া উঠিতেছে, সেটি হইতেছে অধ্যাত্মকে জীবনের উপর ফলাইয়া ধরা। আজ দেশের নূতন প্রাণ চাহিতেছে যে, অধ্যাত্মজীবন যেন তাহার ব্যবহারের জীবনেরই প্রতিষ্ঠা হইয়া

দাঁড়ায়। এমন কি, সন্ন্যাস, বৈরাগ্যও দেখিতেছি আর কেবল ধ্যানমগ্ন, আত্মসমাহিত বা উদাসীন হইয়া থাকিতে পারিতেছে না, প্রচারের জন্য, শিক্ষার জন্য, জনসেবার, মানবের কল্যাণ কর্ম্মের জন্য উৎসুক হইয়া পড়িয়াছে। দেশের যাঁহারা চিন্তাবীর মনীষী, তাঁহারা সকলেই এই জীবন-সাধনার উপরে দিনের পর দিন উত্তরোত্তর বেশী জোর দিয়া চলিয়াছেন। ভবিষ্যতে আমরা কোন্ দিকে কি করিব বর্ত্তমানে তাহার বিশেষ ইঙ্গিত বোধ হয় এইখানেই। ইহারই মধ্যে হয়ত রহিয়াছে ভারতের নবজন্মের গুপ্ত রহস্য। ভারত চাহিতেছে তাহার জীবনপ্রতিষ্ঠানের যে সব বাহ্যিক রূপ তাহা হইতে আপনাকে সরাইয়া লইয়া অন্তরাত্মার গভীরতম সত্তার মধ্যে ডুবিয়া যাইতে এবং সেখান হইতে একটা অধ্যাত্মশক্তির মুক্তধারা লইয়া আসিয়া, ফিরিয়া আবার সমস্ত জীবনকে ওতপ্রোত ভাবে তাহার ধারায় অভিষিক্ত করিয়া তুলিতে।

কিন্তু জীবনকে ধরিয়া চালাইবার জন্য এই অধ্যাত্মশক্তি কোন্ কোন্ মৌলিক চিন্তাসূত্র, কি রকম করণ বা প্রণালী সব আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহা এখনও স্থির করিয়া বলা যাইতেছে না। কারণ, নবভারত এখনও

বস্তুকে বুদ্ধির মধ্যে সুস্পষ্ট সুসীম করিয়া ধরিতে পারে নাই ; নানা ধর্ম্মমত, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান সবই তাহার হইতেছে পিছনের আধ্যাত্মিক প্রেরণার বাহ্য লক্ষণ মাত্র—ধর্ম্মসাধনা জিনিষটাই এখন হইতেছে আপনার নিভৃত শক্তিকে লাভ করিবার জন্য অধ্যাত্মশক্তির নিবিড় প্রয়াস। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ বা প্রসার হইতে থাকে তখন, যখন সে আধ্যাত্মিকতা মনের মধ্যে এমন সমর্থ চিন্তা তুলিয়া ধরে যাহার কাজ জীবনে রূপ সৃষ্টি করা, এমন সব আদর্শ ফুটাইয়া তোলে যাহা নূতন নূতন দিকে বুদ্ধিকে নিযুক্ত করে, ফলাইয়া ধরিবার জন্য প্রাণশক্তিকে প্রচালিত করে।

ভারতবর্ষে দর্শনের কাজ ছিল বুদ্ধির সহায়ে বুদ্ধির ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা উপলব্ধিকে প্রকাশ করা। কিন্তু বর্ত্তমানে এই দার্শনিক বুদ্ধি এখনও কোন নূতন সৃষ্টি সম্যক্ আরম্ভ করিতে পারে নাই। এ যাবৎ ইহা পুরাতন জ্ঞানসম্পদ্‌কেই ফিরিয়া আবার—হয় ত ভিন্ন কথায়—বলিতে চেষ্টা করিয়াছে ; কিন্তু জ্ঞানের, আদর্শের পরিধি বাড়াইয়া ধরিবার জন্য কোন নূতন তথ্য স্থাপনের দিকে তেমন অগ্রসর হইতে চাহে নাই। ইউরোপীয় দর্শনের সংস্পর্শও তাহার মধ্যে নবসৃষ্টির ধারা কিছু

উৎপাদন করিতে পারে নাই। ইহার অবশ্য কারণ আছে। প্রথমতঃ, দর্শনের ক্ষেত্রে ইউরোপের নিকট হইতে গ্রহণ করিবার মত ভারতের তেমন কিছু আছে কি না সন্দেহ। ইউরোপের দর্শনে পাই যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তথ্য, তাহা দেখি ভারতবর্ষ আগেই আবিষ্কার করিয়া বসিয়া আছে, তাহার নিজের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ও প্রতিভার সহিত সামঞ্জস্য থাকে এমন যথাযোগ্য ভাবে ও রূপে। অবশ্য ইদানীন্তনকালে নীট্‌শ, বের্গসন ও জেম্‌স'এর চিন্তা এখানে ওখানে দুই একটি মনকে স্পর্শ করিয়াছে বলা যাইতে পারে; কিন্তু তবুও ইঁহাদের সিদ্ধান্তে স্থূল প্রত্যক্ষ, বাহ্য কর্ম্মফল, মানুষের প্রাণশক্তিকে এতখানি বড় করিয়া দেখা হইয়াছে যে, মনে হয় না ভারত তাহাকে সত্যতঃ কখন আপনার বস্তু করিয়া লইতে পারিবে। ভারতের দর্শন বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে একমাত্র অধ্যাত্মদৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া। গত শতবৎসর ধরিয়া যত ধর্ম্মান্দোলন উঠিয়াছে, তাহারা যে সব অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা তুলিয়া ধরিয়াছে, তাহারই ফলস্বরূপ শুধু পাওয়া যাইতে পারে ভারতের নবদর্শন। ইউরোপের মত, কেবল বিচার-বিশ্লেষণ-পরায়ণ তর্কবুদ্ধি অথবা বৈজ্ঞানিক চিন্তা জ্ঞান কখন ভারতে দর্শনের

জন্ম দিতে পারিবে না। তা ছাড়া, নূতন সৃষ্টি করিতে পারে এমন সমর্থ তর্কবুদ্ধিও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে উঠিয়া সে ধরণের ক্ষেত্র কিছু প্রস্তুত করিয়া যাইতে পারে নাই। যাঁহাদেরই ছিল নিজস্ব একটা চিন্তাশক্তি, তাঁহারা সে বৃত্তি তাঁহাদের প্রয়োগ করিয়া দিয়াছেন বিশুদ্ধ সাহিত্যে, কিম্বা ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছেন আধুনিক ভাব চিন্তা সব আত্মসাৎ করিয়া লইতে, বড় জোর, ভারতীয় ছাঁচে ঢালাই করিতে। আজকাল হয়ত একটা সমর্থতর চিন্তাশক্তির খেলা ফুটিয়া উঠিতেছে, কিন্তু তাহার মধ্যে স্থিরত্ব কিছু নাই, তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও কিছুই বলা চলে না।

পক্ষান্তরে, সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্পষ্ট কিছু যে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত এই কয়টি বিষয়েও বঙ্গদেশই প্রধানতঃ পথ দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঙ্গলাই যেন ভারতশক্তির প্রথম পরীক্ষাগার; এখানেই নূতন আদর্শ, নূতন আশা, নূতন আকাঙ্ক্ষা সব নূতন রূপের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ঢালাই পেটাই হইতেছে। ভারতের আর আর প্রদেশে নবসৃষ্টির প্রয়াস অনেক চলিয়াছে বটে, এক আধ জন প্রতিভাশালী লেখক বা কবিরও উদ্ভব হইয়াছে

শুনা যায় ; কিন্তু একমাত্র বাঙ্গলাই ইতিমধ্যে গড়িয়া তুলিয়াছে রীতিমত একটা সাহিত্যের রাজ্য—সে সাহিত্যের আছে নিজস্ব প্রাণ, নিজস্ব রূপ, পাকা বনিয়াদ তাহার স্থাপিত হইয়াছে ; তাই এখন দিন দিনই তাহা বাড়িয়া চলিয়াছে। বাঙ্গলার চিত্রশিল্প আর নগণ্য নয়,—একটা সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধ, একটা আধ্যাত্মিক দৃষ্টির দ্বারা অনুপ্রাণিত এই বাঙ্গলার আপনকার শিল্প বিশ্বশিল্পের খুলিয়া দিয়াছে একটা নূতন ধারা। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দুই জনের নাম আমরা সকলেই জানি—তাঁহাদের এক জনের আবিষ্কার ত একটা ওলটপালট ঘটাইয়াছে ; তা ছাড়া, বাঙ্গলায় যে তরুণ গবেষকমণ্ডলী গড়িয়া উঠিয়াছে, বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে তাহাদের দানও আজকাল হিসাব করিতে হইতেছে। সুতরাং বঙ্গদেশের দিকে লক্ষ্য করিলেই আমরা বুঝিতে পারি, ভারতের মতি, ভারতের গতি বিশেষ ভাবে, বাঙ্গলার চিত্রকলা এ বিষয়ে আমাদের যতখানি সাহায্য করিবে, ততখানি আর কিছুতে করিবে না—এমন কি, বঙ্কিমের গদ্যও নয়, রবীন্দ্রের কাব্যও নয়। তার কারণ, বাঙ্গলার কবিতাকে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া চলিতে হইয়াছে, এবং এখনও সে যে ঠিক পথটায় পাকাপাকি উঠিতে

পারিয়াছে, এমন বলা যায় না; কিন্তু বাঙ্গলার চিত্র-শিল্প এমন চেষ্টাতে পা বাড়াইতেই, একটা যেন অপরোক্ষ উপলব্ধির বলেই, একেবারে তাহার স্বধর্ম্মের স্বরূপের পথে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এ রকম যে হইয়াছে তাহার প্রথম হেতু এই যে, বাঙ্গলার নূতন সাহিত্যের গোড়া-পত্তন হইয়াছে বিদেশী প্রভাবের, একটা অস্পষ্টতার অনিশ্চয়তার যুগে। ভারতের শিল্প কিন্তু সে সময়ে চুপ করিয়া পড়িয়াছিল, কোন রকম সাড়াশব্দ দেয় নাই—অবশ্য রবিবর্ম্মার বীভৎস প্রয়াস মাঝখানে কিছু দিন সোরগোল তুলিয়াছিল, কিন্তু সুন্দরের নামে সে কুৎসিতের পূজা বন্ধ্যা নারীর গর্ভবেদনার মতই যে নিরর্থক, নিষ্ফল হইয়া পড়িবে তাহা স্বাভাবিক। ভারতের নব শিল্প জন্ম লইল ভারত যখন আপনাকে পাইতে চলিয়াছে, দেখিয়াছে একটা স্পষ্টতর জ্ঞানের আলোক। তা ছাড়া, দ্বিতীয় হেতু হইতেছে এই যে, সাহিত্যের আশ্রয় যে বাক্য ও অর্থ তাহাতে যতখানি আছে অবকাশ, তারল্য, বৈচিত্র্য, তাহার তুলনায় চিত্র বা ভাস্কর্য্য যে সব রূপ ও ভাব ধরিয়া চলে, তাহাতে আছে বেশী রকম বাঁধাবাঁধি। কিন্তু চিত্র বা ভাস্কর্য্যের ক্ষেত্র এই রকমে সঙ্কীর্ণ বলিয়াই তাহার

আছে একটা সহজ নিবিড়তা, তীব্রতা আর সেই জন্যই তাহাদের মধ্যে সাহিত্যের চেয়ে সহজে পাই স্পষ্ট নিশ্চয় নির্দ্দেশ। আর বাঙ্গলার নবীন শিল্পীদিগের বিশেষত্ব, সমস্ত শক্তি দেখি এইখানে, যে তাঁহারা জিনিষের স্থূলরূপ ও ব্যক্ত অর্থকে ধরিয়া দেখাইতে চাহেন নাই, গোড়া হইতেই তাঁহাদের সঙ্কল্পই ছিল জিনিষের অন্তরাত্মার অব্যক্ত রহস্যের সন্ধান। বাঙ্গলার শিল্পের উৎস অপরোক্ষ অনুভূতি, এবং যে রূপ সে রচিয়া তুলিয়াছে, তাহা হইতেছে এই অপরোক্ষ অনুভূতিরই নিজস্ব ছন্দঃ, আমাদের তর্কবুদ্ধি স্থূল চক্ষুর প্রমাণে যে আকার মাপিয়া জুকিয়া তৈয়ার করে সে সকলের সহিত উহার কোন সম্বন্ধই নাই। এই শিল্প সীমার উপর ভর করিয়া হেলিয়া পড়িয়াছে অসীমের অব্যক্তের দিকে, তাহারই কিছু ইঙ্গিত আভাস আবিষ্কারের জন্য; বাহিরের জীবনের, স্থূল প্রকৃতির দিকে সে ফিরিয়াছে, তাহার উপরে এমন রেখা, এমন রঙ, এমন ছন্দঃ, এমন রূপ সব খেলাইয়া তুলিতে যেন ফুটিয়া উঠে আর এক রকম জীবনের, জীবনাতীতের অভিব্যঞ্জনা, আর রকম প্রকৃতির, স্থূল প্রকৃতি আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে যে প্রকৃতি তাহার দৃশ্যাবলী। ভারতীয় শিল্পকলার ইহাই

হইল সনাতন ধর্ম্ম। এই সনাতন ধর্ম্মেরই নূতন প্রয়োগ, নূতন ধারা আজ সে দেখাইতেছে। প্রাচীনতর শিল্পে যতখানি ছিল রূপকের, পৌরাণিক কথাকাহিনীর আধিপত্য, ভাবের বা তত্ত্বের বৃহৎ ব্যঞ্জনা, আধুনিক শিল্পে তাহা নাই; আধুনিক শিল্প দিতে চাহিতেছে আভাসে ইঙ্গিতে অতি সন্তর্পণে একটা নিবিড় সাক্ষাৎ সূক্ষ্ম রূপায়ন। এই শিল্প বাস্তবিকই একটা নূতন সৃষ্টি; আশা করা যায়, বাঙ্গলা এই যে পথ খুলিয়া দিয়াছে, তাহাতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ উঠিয়া আসিয়া চলিতে থাকিবে। শুধু তাই নয়, কলিকাতার নূতন শিল্পীমণ্ডলী শিল্পের দিয়াছে যে বিশেষ ধরণধারণ, তাহা বাঙ্গলার প্রাণেরই অন্তরঙ্গ বিকাশ; সুতরাং অন্যান্য স্থানের নূতন শিল্পী আরও নূতন ধরণধারণে আপনাকে প্রকাশ করিয়া চলিতেছেন, ভিন্ন ভিন্ন পথ খুলিয়া ধরিতেছেন, এরকমও আমরা অচিরে দেখিতে পারি। কিন্তু ভারতের মহত্ত্ব এইখানে যে, একদিকে তাহার আছে যেমন প্রদেশগত শিক্ষাদীক্ষার বিপুল বৈচিত্র্য, তেমনি অন্যদিকে সে সমস্তকে ধরিয়া আছে তাহার একটা নিবিড় অখণ্ড দেশগত ঐক্য। ভারতশিল্পের নব অভ্যুত্থানে ভারতের এই প্রকৃতিটিই যথাযথ প্রতিফলিত হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা।

ভারতের নবজন্ম

বঙ্গদেশের কাব্য ও সাহিত্য স্পষ্ট দুইটি বাঁক পার হইয়া আসিয়াছে এবং মনে হয় এখন আর একটি অনুসরণ করিবার উপক্রম করিতেছে; কিন্তু এই তৃতীয়টির স্বরূপ যে কি হইবে, তাহা আগে হইতেই ঠিক বলা যাইতেছে না। তাহার আরম্ভ ইউরোপীয় অর্থাৎ বেশীর ভাগই ইংরাজী প্রভাব লইয়া; সেই যুগেই আমদানী হইয়াছে গদ্যের ও পদ্যের নূতন নূতন ছাঁচ, নূতন নূতন সব সাহিত্যিক ভাব, রসায়নের বিধান। তখনকার সৃষ্টিতে ছিল প্রাচুর্য্য, ছিল উৎফুল্লতা; অনেক কবি তখন দেখা দিয়াছেন—শুধু পুরুষ নয়, মেয়েদের মধ্যেও। তাঁহাদের দুই জন বা একজন ছিলেন রীতিমত প্রতিভাবান স্রষ্টা, অন্যান্যের কবিত্বশক্তিও অকিঞ্চিৎকর ছিল না। সৌন্দর্য্যে মহত্ত্বে পরিপূর্ণ অনেক কিছুই রচিত হইয়াছিল। ফলতঃ, বলা যাইতে পারে জাঙ্গাল ভাঙ্গিয়া সরস্বতীর মুক্তধারা তখন বিপুল উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছিল। তখনকার কাজে কেবলই ছিল যে স্থূল অনুকরণের ছাপ, তাহা নয়। সত্য বটে, বিদেশীর প্রভাব সর্ব্বত্রই চক্ষু চাহিলেই নজরে পড়িত, কিন্তু দেশের প্রাণ তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া লইতেছিল, কেবলই অবশ হইয়া তাহার দ্বারা চালিত হইতেছিল না।

বাঙ্গলার যে বিশেষ ধাত, তাহার নিজস্ব যে রসবোধ, তাহারই ছাঁচে সকল বাহিরের প্রভাবকে ফেলিয়া ঢালাই করিয়া সে গড়িয়া তুলিতেছিল আপনারই অন্তরাত্মার বাঙ্ময় মূর্ত্তি। তবুও স্বীকার করিতে হইবে যে, রূপ হিসাবে যাহাই হউক কিন্তু বস্তু হিসাবে সেখানে যাহা পাই, তাহা দেশের অন্তরাত্মারই সম্পদ বলিয়া মনে হয় না, তাই সেখানে অনুভব হয় কেমন একটা শূন্যতা। সাহিত্যের দেহে,—তাহার ভঙ্গীতে, তাহার ভাষায় দেখি লাগিয়া রহিয়াছে বাঙ্গলার কবিতার জন্ম-সিদ্ধ চিরপরিচিত একটা লালিত্য, একটা সুঠাম কমনীয় গড়ন ; কিন্তু আসল যে জিনিষ, যে পদার্থ এমন সুন্দর পরিচ্ছদে ব্যক্ত করিয়া ধরা হইয়াছে তাহার মূল্য কষিয়া দেখিতে গেলে বিশেষ কিছু পাই না। এ রকম হইতে বাধ্য। স্রষ্টা যত বড়ই হউন না কেন, তাঁহার সৃষ্টিতে স্বাধীন চিন্তার, নিজস্ব অনুভূতির আবেগের অপেক্ষা বেশীর ভাগই যখন থাকে অপরের ভাব ও ভঙ্গী নিজের করিয়া লইবার আয়াস, তখন সে সৃষ্টি সমর্থ সারবান হইতে পারে না, স্রষ্টার বাস্তব সৃষ্টি স্রষ্টার ভিতরের সামর্থ্যের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু এই যুগও অনেকদিন পার হইয়া গিয়াছে। তাহার যে কাজ করিবার তাহা সে করিয়াছে। তাহার সাহিত্য-সৃষ্টি এখন অতীত ইতিহাসের মধ্যে আপন ন্যায্য স্থান করিয়া লইয়াছে। এই যুগের স্রষ্টাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন দুই জন। এক জনের ভিতর দিয়া বাঙ্গলার গদ্য সাহিত্য পাইয়াছে চরম স্ফূর্ত্তি—এক দিকে তাঁহার চিন্তার ধারা যেমন ছিল নূতন সম্পূর্ণ নিজস্ব, অপর দিকে তেমনি ছিলেন তিনি রসজ্ঞ সিদ্ধ রূপদক্ষ। আর একজন যিনি তিনি এই যুগের শেষ আলোক-বর্ত্তিকা যখন জ্বলিয়া নিবিয়া যাইবে যাইবে করিতেছে তখন আসিয়া দেখা দিলেন; তিনি কিন্তু সেই শেষের স্ফুলিঙ্গ হইতে আবার নূতন একটা সুর, কবিত্বের একটা গভীরতর মূর্চ্ছনা জাগাইয়া ধরিলেন, বাঙ্গলার যে সত্যকার প্রাণ তাহাকেই মূর্ত্ত করিয়া তুলিলেন। বঙ্কিমের যে কাজ তাহা এখন অতীতের বস্তু। তাঁহার কাজ বাঙ্গলার নবীন মনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে—বাঙ্গলার এই নবীন মন তাঁহারই প্রভাবে যতখানি গড়িয়া উঠিয়াছে আর কিছুতে তাহা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ এখনও বর্ত্তমানের অনেকখানি ধরিয়া চালাইতেছেন—তবুও বর্ত্তমানকে ছাড়াইয়া ভবিষ্যতের পথও তিনি

খুলিয়া দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ দেখাইতেছেন দেশ কি রকমে আপনার অন্তরাত্মার দিকে ক্রমেই ফিরিয়া চলিয়াছে, ভারতের সনাতন অন্তরাত্মাই কি রকমে আপনাকে নূতন নূতন রূপে ব্যক্ত করিতেছে। দুইজনেই উষার বৈতালিক; তাঁহারা পাইয়াছেন যাহা তাহা অপেক্ষা খুঁজিতেছেন বেশী, যাহা গোচর করিয়া ধরিয়াছেন তাহা অপেক্ষা যাহার আভাস দিতেছেন তাহা বেশী। বর্ত্তমানে আবার দেখিতেছি একটা নূতন কিছু গড়িয়া উঠিবার প্রস্তাবনা চলিয়াছে। একদিকের প্রয়াস রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে ধরিয়া, তাহাকে বাড়াইয়া, তাহারই নূতনতর বিকাশের পথে চলা; অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের বিরোধী ধারা, তাহা চায় আরও জাতীয় ভাবের, সম্পূর্ণ এই দেশের মাটির অনুপ্রেরণা। কিন্তু পরিণাম যে ঠিক কি হইবে তাহা এখনও পরিষ্কার দেখা যাইতেছে না। তবুও মোটের উপর বোধ হইতেছে যেন বাঙ্গলার সাহিত্যের ধারাও তাহার নব্যশিল্পের ধারা চলিয়াছে যে দিকে সেই দিকেই ঘুরিয়া চলিবে—তবে সাহিত্যের উপকরণ, কথা ও অর্থ, স্পষ্ট বাক্য ও স্ফুট চিন্তা বলিয়া সেখানে আমরা আশা করি স্বভাবতই দেখা দিবে প্রকাশের ধারায় আরও

ব্যাপকতা, ভাবের কল্পনায় অধিকতর বৈচিত্র্য। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে এখন পর্য্যন্তও তেমন কোন চরম স্রষ্টা পুরুষ আসিয়া আবির্ভূত হন নাই, যাঁহার বাণীর মধ্যে আমরা এই রকমের একটা স্পষ্ট অব্যর্থ নির্দ্দেশ পাইয়া স্থির হইতে পারি। তবে আশার কথা, চারিদিকের অনিশ্চয়-তার মাঝে যে সব কবিকণ্ঠ মন্দ্রিত হইয়া উঠিয়াছে, ইতিমধ্যে তাহাতেই আমরা পাইতেছি একটা আভাস ইঙ্গিত, একটা ভরসা যে, নবীন ভারতের হইবে নূতন ধরণের এক সাহিত্য, তাহার প্রতিষ্ঠায় থাকিবে গভীরতর কল্পনা, অপরোক্ষ অনুভূতি।

মনের জগতে—যত সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যেই হউক না কেন—একটা কিছু স্পষ্ট আরম্ভ বা আরম্ভের সূচনা যে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের বাহিরের জীবনের দিকে যখন তাকাই, তখন দেখি সেখানে কেবলই অনিশ্চয়তা, কেবলই বিশৃঙ্খলতা। এই অবস্থার কারণ বেশীর ভাগ দেশের রাজনীতিক ব্যবস্থা—সে ব্যবস্থা প্রাচীন ব্যবস্থা নয়,—প্রাচীনের প্রাণ তাহার মধ্য হইতে অনেক দিনই চলিয়া গিয়াছে—আবার কার্য্যতঃ তাহা ভবিষ্যতের ব্যবস্থারও অনুরূপ হইয়া উঠিতে পারে নাই। একবার আশা আর একবার

নিরাশার তরঙ্গে তরঙ্গে ক্রমাগতই প্রতিহত হইয়া দেশ যে উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্যের ঘূর্ণিপাকে বিপর্য্যস্ত হইয়া চলিয়াছে, সে রকম অবস্থায় নবজন্মের অনিবার্য্য নির্দ্দেশ দেশের জীবনে মূর্ত্ত হইয়া ফুটিতে পারে না। যেটুকু স্পষ্ট নিশ্চিত বর্ত্তমানে তাহা এই যে, বাহ্যিক অনুকরণের যুগ, যে যুগে ইউরোপের রাজনীতিক আদর্শ ও উপায়ের অন্ধ অনুসরণ আমরা করিয়াছি সেই প্রথম যুগ কাটিয়া গিয়াছে। বিগত বৎসর দশেক ধরিয়া যে আন্দোলন হইয়াছে তাহার ধাক্কায় ভারতবাসীর প্রাণে একটা নূতন রাজনীতিক ভাব জাগিয়াছে—সে আন্দোলন একটা উগ্র দেশপ্রেমকে একান্ত করিয়া ধরিয়া চলিয়াছে, দেশ ছাড়া আর কোন কথা বলিতে চাহে নাই, দেশ-সেবাকেই তাহা ধর্ম্মসাধনার পদে উন্নীত করিয়া ধরিয়াছিল, রাজনীতির ক্ষেত্রে ধরিয়া প্রয়োগ করিতেছিল প্রাচীন ধর্ম্মের দর্শনের সব সংজ্ঞা, দেশকে মাতারূপে শক্তিরূপে ইষ্ট করিয়া পূজা করিয়াছে, ভারতের সহজাত আধ্যাত্মিক চিন্তা ও প্রেরণার উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিতে চাহিয়াছে আধুনিক গণতন্ত্রবাদকে। সে আন্দোলন দেশের আত্মপ্রকাশের কোন সুঠাম রূপায়ন গড়িয়া দিতে পারে নাই; তাহার ধরণধারণ অনেক সময়েই

ছিল অতিস্থূল রকমের, নেহাৎ অনিশ্চিতভাবের; সমস্ত চেষ্টা সে সংহত করিয়া প্রয়োগ করিয়াছে অতীতের ও বর্ত্তমানের অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে নূতন সৃষ্টির সংগঠনের কাজ সুচারুরূপে পরিচালিত করিতে সফল হয় নাই। তবুও এই শৃঙ্খলাহীন প্রয়াস দেশের লোককে সত্য সত্যই জাগাইয়া গিয়াছে, ভারতের রাজনীতিক মন ও জীবনকে একটা বিশেষ ধারায় ঘুরাইয়া ধরিয়াছে—ইহার শেষ ফল আজ আমরা দেখিতে পারি না, দেখিব সেই দিন, যে দিন নিজের ভাগ্যকে নিজে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ভারতের হইবে অবাধ পুরুষকার ও সামর্থ্য।

ভারতের সমাজের অবস্থা আরও বিশৃঙ্খল ও অনিশ্চিত। চারিদিকের আবহাওয়ার চাপে পুরাতন রূপ সব খসিয়া ধ্বসিয়া পড়িতেছে, যে সত্যে যে প্রাণে তাহারা সঞ্জীবিত ছিল তাহা ক্রমেই লুপ্ত হইয়া যাইতেছে অথচ বাহিরের কাঠামটি কোন রকমে টিকিয়া চলিয়াছে। লোকে বহুদিনের অভ্যাসকে ছাড়িতে পারিতেছে না, গতানুগতিক চিন্তার ও প্রেরণার বশেই জড়ের মত পুরাতনের খাত অনুসরণ করিতেছে; অথচ নূতনের জন্মগ্রহণ করিবার মত পরিণতি ও সামর্থ্য এখনও হয়

নাই। ভাঙ্গন চলিয়াছে বটে অনেক দিকে, কিন্তু তাহা এত ধীরে ধীরে যে এক রকম লক্ষ্যই করা যায় না। অতীত একটা নিথর জগদ্দল পাথরের মত শক্ত অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে—তাহার মধ্যে নূতন গঠনের কোন অবকাশেরই সম্ভাবনা এখন পর্য্যন্তও দেখা যায় না। সমাজসংস্কার লইয়া খুব সোরগোল হইয়াছে বটে। কত জনা ইউরোপীয় সমাজের নমুনা ও আদর্শ দেশের সম্মুখে ধরিয়াছেন, অনেকে আবার পুরাতন কালেরই বিধিব্যবস্থা চরম সুন্দর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু ফলে সর্ব্বত্রই হইয়াছে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। কারণ এরকম ভাসা ভাসা আন্দোলনে অভাব দৃঢ় নিষ্ঠা, সাধারণ লোকের উপর সে সকল কোন প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে নাই, তাহাদের যে প্রাণের সত্য তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। সমাজসংস্কার যখন ধর্ম্ম-প্রেরণার সহিত সংযুক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে—যেমন ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ প্রভৃতি কয়েকটি নূতন সমাজে—তখনই শুধু দেখি একটা স্থায়ী সমর্থ কিছু কাজ হইয়াছে। এই সাথে সাথেই আবার গোঁড়া যে হিন্দুসমাজ তাহাও আপনাকে বাঁচাইয়া বর্ত্তাইয়া রাখিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বলা

বাহুল্য, এ আন্দোলনের পিছনেও গভীর কোন প্রেরণা নাই—সেখানে আছে বুদ্ধির খোসখেয়াল আর না হয় হৃদয়াবেগের বিলাস—যে সব সত্য যে সব শক্তি বাস্তবকে আজ ধরিয়া গড়িতেছে তাহাদের ছায়া পর্য্যন্ত উহার মধ্যে পাই না। তবে আস্তে আস্তে দেশবাসীর চেতনায় এই কথা ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে আমাদের সামাজিক নীতি, সামাজিক প্রতিষ্ঠান সব নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিতে হইবেই হইবে এবং সেই জন্য দেশকে নিজের অন্তরের সত্যে প্রবুদ্ধ হইতে হইবে,—যে সব সত্য তাহারই নিজের শিক্ষাদীক্ষার অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্ত সে সকল রহিয়াছে গভীরতর স্তরে অব্যক্ত অবস্থায়, কেবল সামর্থ্যের ও সুবিধার অভাবে তাহাদিগকে সে জাগ্রতে ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেছে না। বোধ হয়, ভারতের জাতীয় জীবনে যখন আসিবে আরও মুক্ত একটা অবস্থা, তখনই তাহার নবজন্মের পূর্ণতর শক্তি লোকের সামাজিক মন ও কর্ম্মের উপর জাগ্রত প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে।

৪

ভারতে এই যে নবজন্মের আয়োজন চলিতেছে কিন্তু উদ্‌যাপন এখনও হয় নাই, তাহাকে যদি সার্থকনামা হইতে হয়, যদি তাহার অর্থ হয় একটা নূতন শক্তিমান্ দেহে ভারতের অন্তরাত্মার পুনর্জন্ম, ভারতের স্বভাবজ সনাতন ধর্ম্মের—'প্রজ্ঞা পুরাণী'র—নূতন রূপায়ন, তবে তাহাকে দ্বিধাশূন্য হইয়া আরও স্পষ্টতর, পূর্ণতর ভাবে জোর দিতে হইবে তাহার আধ্যাত্মিক প্রেরণাটির উপর ; আরও নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে সেই আধ্যাত্মিক প্রেরণাই আমাদের জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে মূর্ত্ত হইয়া উঠিতে থাকে। ফলতঃ কিন্তু দেখি, ঠিক এই কথাটা এখনও অনেকে ভুল বুঝিয়া থাকেন বা বুঝিতে মোটেও চাহেন না। অবশ্য তাঁহাদের এ রকম মনোভাবের হেতু যে নাই, তাহা নহে। আমাদের দেশে দুই একটা যুগে কালধর্ম্ম অনুসারে সন্ন্যাসবাদ ও ধার্ম্মিকতাকে এতখানি আতিশয্যের মাত্রায় টানিয়া লওয়া হইয়াছিল, আমরা এতখানি পরলোকসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িয়াছিলাম এক সময়ে যে তাহারই প্রতিক্রিয়ায় আমাদের মধ্যে জন্মিয়াছে, জোর

পাইয়াছে এই অবিশ্বাসের অনাস্থার ধারা। কিন্তু তবুও বলিব এই হেতুবাদের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে একটা ফাঁক—ইহার দ্বারা যাহা প্রমাণিত করিবার চেষ্টা হয়, তাহা প্রমাণিত হয় না। আমাদিগকে সময়ে সময়ে জিজ্ঞাসা করা হয়, সাহিত্যে, শিল্পে বা রাজনীতি ও সামাজিক জীবনে আধ্যাত্মিকতা বলিতে আমরা কি ছাই বুঝি—যদিও ভারতের সমস্ত অতীতের শিক্ষাদীক্ষার কথা মনে করিলে ভারতবাসীরই মুখে আজ আবার এ রকম প্রশ্ন শুনিয়া কিছু স্তম্ভিতই হইতে হয়। আমাদিগকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয় কাব্যে বা কলায় একটু আধ্যাত্মিকতার জল ছিটাইয়া দিলে তাহাদের এমন কি গৌরব বাড়িয়া যায়? এই হাওয়ার জিনিষটিকে দিয়া সমাজের বা রাষ্ট্রের যে সমস্ত স্থূল সমস্যা সেগুলির কোন্ সুরাহা হইবে? বাস্তবিক পক্ষে এই যে সব আপত্তি, তাহা ইউরোপের একটা ধারণার প্রতিধ্বনি মাত্র। ইউরোপে অনেক দিন ধরিয়া একটা সংস্কারের মত হইয়া গিয়াছে যে ধর্ম্ম, আধ্যাত্মিকতা হইতেছে এক দিকে, আর এক দিকে বুদ্ধিগত জ্ঞান, বাস্তব জীবন—এই দুইটি ধারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের, তাহাদের প্রত্যেককে অনুসরণ করিতে হইবে আলাদা আলাদা

পথ, প্রত্যেকের রহিয়াছে নিজের নিজের পৃথক্ ধরণ-ধারণ, নিয়মকানুন। এই সঙ্গে আরও একটি সন্দেহ আমাদের উপর আসিয়া পড়ে যে, আধ্যাত্মিকতার নামে হয়ত বা আমরা বাস্তব হইতে কর্ম্মজীবন হইতে ফিরাইয়া লইয়া ভারতকে দিতে চাহিতেছি একটা ভাবুকতার, ধ্যানপরতার আদর্শ। ভারতকে আজ শক্তিমান্ কর্ম্মঠ সংহত 'নেশন' হইয়া উঠিতে হইবে,—বর্ত্তমান জগতের সঙ্ঘর্ষের মধ্যে বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া থাকিতে হইলে তাহাকে বিচারবুদ্ধির আধুনিকতার পথেই অগ্রসর হইতে হইবে; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে আমরা কি পুরাকালের পুরাতন ধর্ম্মান্ধতাকে ডাকিয়া আনিতেছি না, যুক্তিহীন কুসংস্কার সব শিক্ষা দিয়া ভারতকে আবার অজ্ঞানের যুগে টানিয়া লইতেছি না? কথাটা তাহা হইলে আরও পরিষ্কার করিয়া আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিব—আধ্যাত্মিকতাকে ধরিয়া ভারতের নবজীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে, আমাদের এই সূত্রটির প্রকৃত অর্থ কি।

কিন্তু আগে আমাদের সূত্রটির অর্থ কি যে নয়, সেই কথাটাই বলিব। বলা বাহুল্য, সূত্রটি এমন শিক্ষা দেয় না যে, জাগতিক জীবনকে একটা ক্ষণিকের মোহরূপে মনে করিতে হইবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের

সকলকেই মুনি সন্ন্যাসী হইয়া পড়িতে হইবে, মঠের, গিরিগুহার, পর্ব্বতশিখরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই সামাজিক জীবনের সমস্ত বিধিব্যবস্থা বাঁধিতে হইবে, মানব-জাতির সমবেত উন্নতি অথবা ইহলোকের সংস্পর্শে আসে, এমন কোন কিছু লক্ষ্য সামাজিক জীবনের থাকিতে পারিবে না, জীবনের আদর্শ হইবে স্থির নিশ্চল স্থাণুত্বলাভ করা। এই ধরণের প্রেরণা ভারতের মনে এক সময় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, সন্দেহ নাই—কিন্তু তাই বলিয়া ইহা ছাড়া আর কোন প্রেরণা ভারতের যে ছিল না, তাহা নয়। তারপর, আধ্যাত্মিকতা বলিতে এমন বুঝায় না যে, কোন একটা বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যে সব সঙ্কীর্ণ সিদ্ধান্ত, বিধান, অনুষ্ঠান, তাহারই ছাঁচে ফেলিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে একটা সমগ্র জাতীয় সত্তা। এই প্রয়াস পূর্ব্বকালে অনেকবার হইয়াছে বটে এবং বর্ত্তমানেও পুরাতন সংস্কার যেখানে যেখানে নির্ম্মূল হইতে পারে নাই, সেখানে সেখানে চলিতেছে। কিন্তু যে দেশ এত বিভিন্ন বিরুদ্ধ ধর্ম্মমতে পরিপূর্ণ, যাহার মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছে পৃথিবীর তিনটি প্রধান ধর্ম্মের ধারা এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই যেখানে নূতন নূতন শাখা উপশাখা সব জন্মগ্রহণ করিতেছে, সেই দেশে অন্ততঃ এই ধরণের কোন

চেষ্টা সঙ্গতও নয়, সম্ভবও নয়। একটা বিশেষ ধর্ম্মমত অপেক্ষা আধ্যাত্মিকতা অনেক বৃহত্তর জিনিষ। আর আধ্যাত্মিকতা যে নূতন একটা ব্যাপকতর অর্থ লইয়া জগতে ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহার মধ্যে অতি উদারতম ধর্ম্মমতও হইয়া পড়িবে একটা ধারা, একটা অঙ্গমাত্র। সেই আধ্যাত্মিকতা হইতেছে বিশ্বজনীন ধর্ম্ম অর্থাৎ যাহার প্রেরণায় মানুষ খুঁজিতেছে শাশ্বতকে, দিব্যকে, বৃহত্তর সত্তাকে, একত্বের উৎসকে; চেষ্টা করিতেছে যাহাতে লৌকিক জীবনের সহিত লোকাতীত জীবনের স্থাপিত হয় একটা নিকট সম্বন্ধ, সহজ সামঞ্জস্য, সম্মিলন।

আধ্যাত্মিকতা বলিতে আমরা যে কোন রকম জিনিষ কিছু বাদ দিয়া রাখিতে চাহি, তাহা নয়। মানবজীবনে যাহা কিছু মহৎ আদর্শ, আধুনিক জগতে যাহা কিছু বৃহৎ সমস্যা, মানুষের যে কোন প্রকারের ঊর্দ্ধমুখী প্রয়াস, মানুষের অন্তরাত্মা যে কোন নিবিড় প্রেরণা বা বিশেষ উপায়কে ধরিয়া চাহিতেছে বিকাশ, উন্নতি, প্রসারতা, শক্তি, সামর্থ্য, আনন্দ, জ্যোতিঃ, পরিপূর্ণতা—সকলই, সমস্তই আমাদের লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত। দেহ নাই যাহার, মন নাই যাহার সেই আত্মা বা পুরুষ আর যাহাই হউক, মানুষ নয়। সুতরাং মানুষের যে

আধ্যাত্মিকতা তাহা দেহ প্রাণ মনকে যেন হীন অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচনা করে না। বরং এই সমস্তকে বিশেষ প্রয়োজনীয়, বিশেষ মূল্যবান বলিয়াই ধরিতে হইবে—কারণ, এই সকলের ভিতর দিয়া, এই সকলকে যন্ত্র করিয়া তবে মানুষের অধ্যাত্মজীবন লীলায়িত হইয়া উঠে। ভারতের যে প্রাচীন দীক্ষা, তাহা পূর্ব্বতন গ্রীক বা আধুনিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের মতনই—তবে ভিন্ন লক্ষ্যে ও মহত্তর উদ্দেশ্যে—জোর দিয়া আসিয়াছে দেহ, প্রাণ ও মনের স্বাস্থ্য শক্তি উন্নতির উপরে। তাই যাহা কিছু দিয়া এই অঙ্গ কয়টির পূর্ণতা সাধন হইতে পারে, তাহারই অবাধ অনুশীলনের পথ সে করিয়া দিয়াছে। মস্তিষ্কের চর্চ্চা, দর্শন বিজ্ঞানের আলোচনা, রসবোধের তৃপ্তি, ছোট বড় সকল রকম শিল্পকলা, শরীরের স্বাস্থ্য ও বল, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, সমস্ত জাতিটিরই সমৃদ্ধি, স্বচ্ছলতা, পারিপাট্য, তাহার ক্ষাত্রশক্তি, রাষ্ট্রীয় শক্তি, সামাজিক শক্তি—সকল দিকেই ভারত সমান মনোযোগ দিয়া আসিয়াছে। আজকাল যেমন আমাদিগকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা হয়, সে রকম কোন দিনই ভারত দারিদ্র্যকে একটা জাতীয় আদর্শ বা সাধনারূপে গ্রহণ করে নাই, কোন

দিনই এমন বিধান সে দেয় নাই যে নগ্নতা শ্রীহীনতাই হইতেছে আধ্যাত্মিকতার একমাত্র অঙ্গরাগ। প্রাচীন ভারতের লক্ষ্য ছিল উর্দ্ধে, কিন্তু নীচের প্রতিষ্ঠাকেও সে দৃঢ় ও বিস্তৃত করিয়া গড়িয়া দিয়াছিল, এবং যে সকল যন্ত্রপাতি উপকরণ দিয়া গোড়ার বাঁধ, সেগুলির উপরও বিশেষ যত্নই সে দিয়া আসিয়াছে। নবীন ভারতকেও এই সাধনাই করিতে হইবে, তবে নূতন নূতন পথে, নবতর বৃহত্তর সব ভাবের প্রেরণায়; আর তাহার যন্ত্রাদিকেও আধুনিক জগতের যে জটিলতা তদনুরূপ করিয়া ঢালিতে হইবে। শুধু তাই নয়, তাহার কর্ম্মের প্রয়াসের প্রসারতা, তাহার মনোবৃত্তির বৈচিত্র্য প্রাচীন ভারতের অপেক্ষা অল্পতর হইবে না, বরং আরও বিপুলতর হইয়াই দেখা দিবে। আধ্যাত্মিকতাকে কেবল 'নেতি নেতি' হইতেই হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই; তাহার মধ্যে আবার সকল জিনিষই স্থান পাইতে পারে —আর এইটিই আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ রূপ।

তবুও বলিতে হইবে যে জগৎকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখা আর শুধু জড়ের স্তর বা মনের স্তর হইতে দেখা এক জিনিষ নয়—উভয়ের মধ্যে আছে বিপুল পার্থক্য। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে আমরা দেখি দেহ প্রাণ আর মন

মানুষের লক্ষ্য নয়, উপায় মাত্র; আর উপায়ের মধ্যেও তাহা শ্রেষ্ঠ বা চরম নয়; দেহ প্রাণ মন লইয়া হইতেছে আধারের অতি বাহিরকার যন্ত্র, মানুষের সমস্ত সত্তা ইহারই মধ্যে নিঃশেষ হয় নাই। আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দেখাইয়া দেয় যে সকল সসীম জিনিষের পিছনে রহিয়াছে অসীম, এই অসীমের কষ্টিপাথরেই ধরিয়া সে নিরূপণ করে সব সসীমের মূল্য। অসীমের অসম্পূর্ণ খণ্ড খণ্ড রূপায়ন হইতেছে সসীম, সসীমের নিত্য প্রয়াস অসীমকে আরও যথাযথ প্রকাশ করিয়া ধরিতে। মানুষের জগতের পশ্চাতে, ব্যক্ত বাস্তব অপেক্ষা রহিয়াছে যে একটা মহত্তর বাস্তব, আধ্যাত্মিক দৃষ্টি কেবল তাহাই উদ্ঘাটন করিতেছে না; কিন্তু মানুষের, জগতের অন্তরে, অন্তরাত্মার মধ্যে সে দেখিতেছে পুরুষকে, এই পুরুষকেই সকলের উপরে সে আসন দিয়াছে, মানুষের আর সকল অঙ্গকে নির্দ্দেশ দিতেছে যে প্রকারে হউক না কেন এই দিব্য সত্তাকে প্রকাশ করিয়া মূর্ত্ত করিয়া ধরিতে। এই আত্মা, এই পুরুষ, এই দিব্যসত্তাকেই যেন মানুষ জগতে সকল বাহ্যরূপের অন্তরালে প্রতিনিয়ত দেখিতে শুনিতে চেষ্টা করে, নিজের জীবন মন যেন ইহারই সহিত একীভূত করিয়া

ধরে, ইহারই মধ্যে যেন সকল মানুষের সহিত একত্ব অনুভব করে। ফলে, আমাদের সাধারণ নিত্য-নৈমিত্তিক দৃষ্টিকে যে অনেকখানি বদলাইয়াই ধরিতে হইবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। মানবজীবনের সকল লক্ষ্যকেই ধরিয়া রাখিলেও, তাহাদের দিতে হইবে নূতন একটা অর্থ, নূতন একটা সার্থকতা।

আমরা চাহি দেহের স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য—কিন্তু কোন্ উদ্দেশ্যে? বলা যাইতে পারে, স্বাস্থ্য ও সামর্থ্যের জন্যই জিনিষটা স্পৃহণীয়, তাই। অথবা বলা যাইতে পারে, দীর্ঘজীবনের জন্য, মনে প্রাণে চিত্তে যাহাতে সম্যক্ ভোগ করিতে পারি, তাহার একটা পাকা বনিয়াদের জন্য। নিরাময় সবল দেহের জন্যই চাই নিরাময় সবল দেহ—এ কথা এক হিসাবে সত্য; কিন্তু এই হিসাবে যে দেহও হইতেছে আত্মার প্রকাশ, দেহেরও চাই পরিপূর্ণতা, মানুষের যে অখণ্ড জীবনযাত্রা তাহারই অন্তর্ভুক্ত দেহের সার্থকতা। তা ছাড়া, আরও সত্য হইতেছে এই কথা যে, দেহকে প্রতিষ্ঠা করিয়াই ঊর্দ্ধে উঠিয়া চলিতে হয় মানুষের মধ্যে দিব্য পুরুষের অনুসন্ধানে—সেই জন্যই ত বলা হইয়াছে, 'শরীরং খলু ধর্ম্মসাধনং', ধর্ম্মের সাধনা করিতে হইলে অর্থাৎ যে

অন্তরাত্মার সত্যবিধান লইয়া চলে ভগবৎসমীপে, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে শরীরকেও একটা উপায় বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। সাধারণ বুদ্ধিতে বলা হয় যে মনকে প্রাণকে চিত্তকে উন্নত পরিপুষ্ট করিয়া তোলা দরকার, কারণ, তাহাতে মানুষ অধিকতর আনন্দের অধিকারী হয়, মানুষ তাহাতে পায় আপনার শুদ্ধতর প্রকৃতিরই পরিতৃপ্তি, তাহাতেই সে জীবনের সার্থকতা অনুভব করে। এ কথা সত্য সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা বলিব যে, মন প্রাণ চিত্তও হইতেছে আত্মারই প্রকাশ, মানুষের মধ্যে ইহারা খুঁজিতেছে আপন আপন দিব্য রূপায়ন, ইহাদের শুদ্ধি স্ফূর্ত্তি শক্তি সিদ্ধির ভিতর দিয়া মানুষ জগতের মধ্যে প্রকট যে দিব্য-সত্য, তাহার অনুসন্ধান পায়, তাহাকে বহুল বিচিত্র ভাবে অধিগত করে, তাহারই ছন্দে পরিশেষে নিজের সমস্ত জীবনকে মিলাইয়া মিশাইয়া ধরিতে পারে। নীতি বা সদাচার বলিতে সাধারণতঃ বুঝায় ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনের এমন শৃঙ্খলিত কর্ম্মধারা, যাহার কল্যাণে সমাজ বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া থাকে; সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির আদানপ্রদান নিয়ন্ত্রিত হয় একটা ন্যায়ের, দরদের, আত্মসংযমের ও আত্মোৎসর্গের

বিধান অনুসারে। কিন্তু আধ্যাত্মিক অর্থে নীতি হইতেছে কর্ম্মের মধ্যে, কর্ম্ম অপেক্ষাও বিশেষভাবে স্বভাবের মধ্যে আমাদের অন্তরস্থ দিব্য পুরুষকে ফুটাইয়া তুলিবার একটা উপায়, ভাগবত প্রকৃতির মধ্যে উঠিয়া চলিবার পথে একটা সোপান।

আমাদের অন্যান্য লক্ষ্য, অন্যান্য কর্ম্মৈষণা সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। আধ্যাত্মিকতা সে সকল গুলিকেই বরণ করিয়া লইতেছে, কিন্তু প্রত্যেকেরই দিতেছে একটা বৃহত্তর, গভীরতর, নিবিড়তর দিব্যভাবের অর্থ। পাশ্চাত্যের ধরণ দিয়া বিচার করিতে গেলে, দর্শন হইতেছে শুদ্ধ যুক্তির সহায়ে সৃষ্টির মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা বা গবেষণা। এই সব মূলতত্ত্ব আমরা বাহির করিতে পারি, এক, জড়বিজ্ঞান আমাদের দুয়ারে আনিয়া দিতেছে যে সব বাস্তব সত্য, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, আর না হয়, যুক্তির যে সব মূল বৃত্তি, মস্তিষ্কের যে সব ধারণা, তাহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিয়া, অথবা যুগপৎ এই দুই পন্থার আশ্রয় লইয়া। কিন্তু আধ্যাত্মিক দিক্ দিয়া ধরিতে গেলে, আমরা দেখি যে সৃষ্টির সত্য কেবল যুক্তির সহায়ে কি বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণের সহায়ে পাওয়া

যায় না, তাহা পাওয়া যায় অপরোক্ষ অনুভূতির, অন্তরের উপলব্ধির দ্বারা। দর্শনের কাজ হইতেছে যত রকম উপায়ে যত রকম জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহা সাজাইয়া গুছাইয়া ধরা এবং শেষে সেই সকল জ্ঞান একটা সমন্বয়ের সূত্রে পরম সত্যের সহিত—একম্ অদ্বিতীয়ম্ যে বিশ্বজনীন বস্তু—তাহার সহিত মিলাইয়া ধরা। ফলতঃ, দর্শনের মূল্য ও সার্থকতা ততখানিই, যতখানি তাহা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রতিষ্ঠা গড়িয়া দিতে পারে, যতখানি তাহা মানুষকে মানবীসত্তা হইতে দিব্য ভাগবত স্বরূপে তুলিয়া ধরিতে সাহায্য করে। এইভাবে বিজ্ঞানও তাহার জগতের জ্ঞান লইয়া বিশ্বের মধ্যে বিশ্বের অধিষ্ঠাতৃ পুরুষেরই কর্ম্মধারাকে ফুটাইয়া ফলাইয়া ধরে। বিজ্ঞান অর্থ যে শুধু স্থূলের জ্ঞান, স্থূলজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ অথবা জড় ও জড়শক্তিকে ধরিয়া জীবনীশক্তির, মানুষের, মানুষের মনের বিশ্লেষণ ব্যাখ্যাই হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। আধ্যাত্মিক শিক্ষাদীক্ষা বিজ্ঞানের পরিধিকে আরও বাড়াইয়া দিবে, গবেষণার জন্য নূতন নূতন ক্ষেত্র খুলিয়া ধরিবে। প্রাচীনকালে ছিল যে এক সূক্ষ্ম জগতের বিজ্ঞান, যে সব বিজ্ঞান অন্তরাত্মাকে পুরুষকে মূল সত্য রূপে ধরিয়া চলিত; মনের, এমন কি

মনের উপরে রহিয়াছে যে বৃহত্তর শক্তি, তাহাকে নামাইয়া কার্য্যকরী করিয়া তুলিত জীবনগতির মধ্যে, স্থূল বস্তুর আয়তনে—সেই সূক্ষ্ম বিজ্ঞানেরও পুরাতন ও নূতন নূতন রূপ বিজ্ঞান আলোচনারই অঙ্গ হইয়া উঠিবে। তারপর শিল্পকলা ও কাব্যের গোড়াকার প্রাকৃত লক্ষ্য হইতেছে মানুষের ও প্রকৃতির প্রতিরূপ সৃষ্টি করা, যাহাতে আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ তৃপ্ত হয়, যাহাতে বুদ্ধিবৃত্তির এবং কল্পনার ভাবরাশি সুচারুরূপে আমাদের সম্মুখে মূর্ত্ত হইয়া উঠে। কিন্তু শিল্পকলা, কাব্য যখন হয় অধ্যাত্মদৃষ্টির সৃষ্টি, তখন তাহার লক্ষ্য মানুষের ভিতরে লুক্কায়িত আছে যে মহত্তর পদার্থ সব তাহা ব্যক্ত করিয়া ধরা; যে অধ্যাত্ম রসায়ন, যে বিশ্বসৌন্দর্য্য জগৎ বেড়িয়া আছে তাহাকে প্রকাশ করা। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, মানবজীবনের গোড়াপত্তনের দিক দিয়া দেখিলে হইতেছে মানুষ যাহাতে সমবেত-ভাবে বাঁচিয়া থাকিতে, ধনজন-উৎপাদন করিতে, বাসনা চরিতার্থ করিতে, ভোগ করিতে পারে, যাহাতে দেহপ্রাণমনকে কর্ম্মপটু, সমর্থ করিয়া ধরিতে পারে, তাহারই একটা ব্যবস্থা। কিন্তু আধ্যাত্মিক দীক্ষা এই সকল প্রতিষ্ঠানের আনিয়া দিবে আরও নূতনতর

সার্থকতা। প্রথমতঃ, ইহারা হইয়া উঠিবে জীবনের সাধনক্ষেত্র অর্থাৎ মানুষের এখানে থাকিয়া জাগিবে নিজের সত্যস্বরূপকে দেবত্বকে জানিবার আকাঙ্ক্ষা, পাইবার প্রয়াস। দ্বিতীয়তঃ, ভাগবতসত্তার যে ধর্ম্ম, তাহাকে জীবনলীলার মধ্যে উত্তরোত্তর ফুটাইয়া ধরিতে থাকিবে ইহারা। তৃতীয়তঃ, এই সব আয়তনকে ধরিয়া মানুষ সমবেতভাবে উঠিয়া চলিবে জ্যোতির, শক্তির, শান্তির, একত্বের, সম্মিলনের দিকে; মানবজাতি অন্তরে চাহিতেছে যে দিব্য প্রকৃতি, তাহারই মধ্যে। আধ্যাত্মিক শিক্ষাদীক্ষা, জীবনে অধ্যাত্মের প্রয়োগ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা হইতেছে এই, ইহা অপেক্ষা বেশী আর কিছু নয়, কিন্তু ইহা অপেক্ষা কমও নয়, এইটুকুর মধ্যে আছে যত সম্ভাবনা তৎসমস্তই।

এই আদর্শে যাঁহাদের আস্থা নাই অথবা যাঁহারা ইহা বুঝিতেই পারেন না, তাঁহারা এখনও পাশ্চাত্য-সুলভ জীবনকল্পনায় বিমূঢ় হইয়া আছেন। পাশ্চাত্যের বন্যা ভারতের নিজস্ব ভাবকে এক সময়ে যে ভাসাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাঁহারা আজও সেই স্রোতে গা ছাড়িয়া দিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, ইউরোপ ইতিমধ্যে নিজেই তাহার

পরিচিত গতানুগতিক সংস্কারকে ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে এবং সেই জন্য ঠিক প্রাচ্যেরই দ্বারস্থ হইতেছে। আমরা দেখিতেছি না কি, প্রাচ্যের আদর্শ প্রভৃতি—অবশ্য বাহ্যরূপ নয়, কিন্তু ভিতরের আসল ভাব বস্তু—কি রকমে আস্তে আস্তে ইউরোপের মধ্যে প্রসারিত হইয়া পড়িতেছে? পাশ্চাত্যের চিন্তা, কাব্য, শিল্পকলা, ব্যবহারনীতি সবই প্রাচ্যের রঙ্গে রঙ্গীন্ হইয়া উঠিতেছে? পাশ্চাত্যের উপর এই প্রাচ্যের বন্যা তাই বলিয়া পাশ্চাত্যের নিজস্ব শিক্ষাদীক্ষাকে ভাঙ্গিয়া ভাসাইয়া দিতেছে না, কিন্তু তাহাকে নূতন করিয়া, বৃহৎ করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে। ইউরোপ যখন এই ভাবে নূতন সত্যের আলোকে নিজেকে গরীয়ান্ করিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে, অধ্যাত্মের তত্ত্ব সব ধীরে ধীরে স্বীকার করিয়া মানুষের ভিতরে বাহিরে একটা রূপান্তরের সাধনা করিতেছে, ঠিক সেই সময়ে আমরা ভারতবাসী কি ইউরোপের পরিত্যক্ত জীর্ণবাস বরণ করিয়া লইব, যে পথ চলিয়া সে ছাড়িয়া দিয়াছে, সেই পথেই চলিতে থাকিব, চিরকালই কাল যাহা সে ফেলিয়া দিয়াছে, আজ তাহা আমরা আদরে ঘরে তুলিয়া লইতে থাকিব? ইউরোপ যে মুহূর্ত্তে আমাদের উপর আসিয়া পড়িল তখন

ঘটনাচক্রে আমাদের অবসাদের, দুর্ব্বলতার অবস্থা—এ রকম অবস্থা সকল উন্নত জাতির ভাগ্যেই একদিন না একদিন আসিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া, আমরা যেন আমাদের শিক্ষাদীক্ষার স্বাতন্ত্র্যে আস্থা না হারাইয়া বসি। তাই বলিয়া এমন কিছু প্রমাণ হয় না যে, আমাদের আধ্যাত্মিকতা, আমাদের সাধনা, আমাদের আদর্শ সব ভুল,—সুতরাং আমাদের উচিত যেন-তেন প্রকারে আমাদের ব্যবহারিক জীবনকে ইউরোপের নাস্তিকতার, জড়বাদের ছাঁচে ঢালাই করিয়া ফেলা, আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম্মসাধনা প্রভৃতি যাহা কিছু ভারতের ভারতত্ব, তাহা যৎসামান্য ভাবে পিছনে কোথাও শোভারূপে বসাইয়া রাখিলেই যথেষ্ট! বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধ ইউরোপের পক্ষে একটা প্রলয়, কিন্তু তাহাতে প্রমাণ হয় কি যে ইউরোপের বিজ্ঞান, গণতন্ত্র, ক্রমপ্রগতি সব মায়া মরীচিকা—ইউরোপের উচিত আবার মধ্যযুগে ফিরিয়া যাওয়া অথবা চীনের কি তিব্বতের শিক্ষাদীক্ষাকে অনুকরণ করিয়া চলা? যাহারা ভাবিয়া দেখিতে চাহে না বা পারে না, বাহিরের দুই একটা অসংলগ্ন ঘটনা হইতেই যাহারা ত্বরিতে একটা সাধারণ সূত্র কষিয়া বসিতে চাহে, তাহারাই এমন অপসিদ্ধান্ত করিতে সু-পটু।

ভুল ইউরোপও করিয়াছে, আমরাও করিয়াছি; নিজ নিজ আদর্শের অনুসরণে উভয়েরই পদস্খলন হইয়াছে, উভয়েই অস্বাভাবিক অতিমাত্রায় চলিয়া গিয়াছে। তবে ইউরোপ ঠেকিয়া শিখিতে পারিয়াছে, নিজেকে সংশোধন করিয়া লইতে প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার বিজ্ঞানকে, গণতন্ত্রকে, ক্রমোন্নতি-বাদকে সে বিসর্জ্জন দিয়া বসে নাই, বরং সে চাহিতেছে এ গুলির অভাব ত্রুটী সারিয়া পূর্ণাঙ্গ করিয়া ধরিতে, মহত্তর উদ্দেশ্যে কল্যাণকর পথে তাহাদিগকে চালাইয়া লইতে। প্রাচ্যের জ্যোতিঃ সে বরণ করিয়া লইতেছে বটে, কিন্তু তাহার নিজস্ব চিন্তার ধারা, জীবনযাত্রার প্রণালীকেই প্রতিষ্ঠা করিয়া তবে নিজেকে খুলিয়া ধরিতেছে অধ্যাত্মের সত্যের অভিমুখে; আপনার বিশিষ্ট জীবনের সত্যকে, সামাজিক আদর্শকে, জ্ঞান-বিজ্ঞানকে জলাঞ্জলি সে দেয় নাই। আমাদিগকেও ঠিক তেমনি নিষ্ঠাভরে, তেমনি ভাবে সংস্কারমুক্ত হইয়া ভারতের সনাতন সত্যকে এবং আধুনিক প্রভাব সকলকে কাজে লাগাইতে হইবে। যেখানে যেখানে ভুল হইয়াছে, তাহা সারিয়া লইতে হইবে; আমাদের আধ্যাত্মিকতাকে আরও বৃহত্তর, উদারতর করিয়া জীবন-

ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে; আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের অপেক্ষা কম নয়, যদি সম্ভব হয়, তবে বেশীই আধ্যাত্মিক হইতে হইবে। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানকে, যুক্তিকে, উন্নতিশীলতাকে, আধুনিক যুগের সকল মূল সত্যকেই আমরা গ্রহণ করিব, কিন্তু আমাদের নিজস্ব জীবনধারার উপর দাঁড়াইয়া, আমাদের অধ্যাত্ম আদর্শ ও লক্ষ্যের সহিত মিলাইয়া ধরিয়া। আমাদের চারিদিকে যে জীবনপ্রবাহ বিপুলস্পন্দনে ছুটিয়া চলিয়াছে, আধুনিক প্রাণে যত ঐহিক প্রেরণা, যত আধিভৌতিক কর্ম্মৈষণা খেলিয়া উঠিতেছে, তাহার মধ্যে আমরা ঝাঁপ দিয়া পড়িতে পারি; কিন্তু সে জন্য ঈশ্বর সম্বন্ধে, মানুষ সম্বন্ধে, প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের যে মূল উপলব্ধি তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে কেন? দুইটির মধ্যে ত কোন বিসম্বাদ নাই। বরং তাহারা একটি আর একটির সহায়, পরস্পরের নিভৃত অর্থ রূপায়ন তাহারা পরস্পরে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে, উভয়ে উভয়কে সমৃদ্ধ, ঐশ্বর্য্যপূর্ণ করিয়া ধরিতেছে।

ভারত তাহার নিজত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, স্বধর্ম্মকে অনুসরণ করিয়াই নিজে উন্নত হইবে, জগতের সেবায় আসিবে। এই কথার অর্থ এমন নয়—সঙ্কীর্ণ মন লইয়া

সংস্কারান্ধ হইয়া অনেকে যেমন সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন—যে কালস্রোতে নূতন যাহা কিছু আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতেছে অথবা ইউরোপ যাহা কিছু সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করিয়াছে বা সামর্থ্যের সহিত ব্যক্ত করিয়াছে, তৎসমস্তই দূর করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। এ রকম মনের ভাব যুক্তির দিক দিয়া যেমন মূঢ়তার পরিচয়, কাজের দিক দিয়া তেমনি অসম্ভব—শুধু তাই নয়, ইহা আধ্যাত্মিকতার অভাব। কারণ, সত্যকার আধ্যাত্মিকতা কোন নূতন জ্ঞানকেই পরিহার করে না, মানবজাতির আত্মোন্নতির উপায় বা উপকরণ যদি আরও কিছু জুটিয়া যায় তবে তাহা ফেলিয়া দেয় না। আমাদের অন্তরাত্মাকে, আমাদের সত্তার বিশিষ্ট ধরণকে, আমাদের সহজাত স্বভাবকে অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে এবং তাহার সহিত মিলাইয়া মিশাইয়া ধরিতে হইবে আমরা যাহা কিছু বাহির হইতে আহরণ করিব আর তাহার ভিতর হইতেই বিকসিত করিয়া ধরিতে হইবে আমরা যাহা কিছু কর্ম্ম করিব, যাহা কিছু সৃষ্টি করিব। ইহাই হইল আমাদের সূত্রটির অর্থ। অধ্যাত্ম-ধর্ম্মই বিশেষভাবে ভারতের মনোযোগ চিরকাল আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছে—ইহাই হইল ভারতের অন্তর-

পুরুষের কথা। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে অত্যধিক ধর্ম্মালোচনাই ভারতের সর্ব্বনাশ করিয়াছে; সমস্ত জীবনকে যে আমরা ধর্ম্ম বলিয়া মনে করি অথবা ধর্ম্মকেই আমরা যে মনে করি সমস্ত জীবন,—ঠিক এই কারণেই আমরা জীবনযুদ্ধে হটিয়া গিয়াছি, আমরা তলাইয়া গিয়াছি। এই অনুযোগের উত্তরে আমি কবির ঈষৎ অন্য প্রসঙ্গে ব্যবহৃত ভাষায় বলিতে চাহি না যে আমাদের অধঃপতনে কিছু আসে যায় না, যে ধূলায় পড়িয়া ভারত গড়াইতেছে তাহাও পবিত্র। পতনে, ব্যর্থতায় অনেকখানিই আসে যায়; মানুষের পক্ষে হউক, জাতির পক্ষে হউক ধূলায় পড়িয়া গড়ান খুব সম্মানকর কাজ নয়। কিন্তু আসল কথা, পতনের কারণ যাহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা ত নয়। ভারতের অধিকাংশ লোক যদি সমস্ত জীবনকে সত্য সত্যই ধর্ম্মসর্ব্বস্ব করিয়া তুলিতে পারিত, তবে আর আমাদের এমন অবস্থা হইত না। আমাদের অধঃপতন হইয়াছে, কারণ সমষ্টিগত জীবনে আমরা হইয়া পড়িয়াছিলাম ভীষণ অধার্ম্মিক, আত্মসর্ব্বস্ব, নাস্তিক, জড়বাদী। হইতে পারে, এক সময়ে আমরা একদিকে অত্যধিক ধার্ম্মিকতার দিকে, অর্থাৎ অত্যধিক

পরিমাণে বাহ্যিক অনুষ্ঠান, শাস্ত্র, আচার নিয়মের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলাম; অন্য দিকে আবার চলিয়া গিয়াছিলাম সন্ন্যাসের বৈরাগ্যের অতিমাত্রায়—ফলে, যাঁহারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ তাঁহারাই সমাজ হইতে সরিয়া পড়িয়াছিলেন, প্রাচীন ঋষিদের মত তাঁহারা সমাজের পিছনে সমাজের অধ্যাত্ম প্রতিষ্ঠারূপে দাঁড়াইয়া, সমাজের উপর জ্ঞানের আলো, জীবনের শক্তি ঢালিয়া দিতে পারেন নাই। কিন্তু ভারতের দুরবস্থার মূল হেতু হইতেছে, একটা উদার বিস্তৃত অধ্যাত্ম প্রেরণার সঙ্কোচন, মুক্ত ও সতেজ বুদ্ধিবৃত্তির হ্রাস, মহৎ আদর্শের ক্রমিক অভাব, প্রাণশক্তির ক্ষয়।

এক অর্থে হয়ত আমাদের মধ্যে ধার্ম্মিকতার অত্যধিক প্রাদুর্ভাবই হইয়াছিল। ধার্ম্মিকতা শব্দটি আমরা ইংরাজী 'রিলিজন্' (Religion) এর পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিতেছি—'রিলিজন্' কথাটির ঠিক ভারতীয় প্রতিশব্দ কিছু নাই, ইহার সহিত বিশেষ একটা মতবাদ, আচার অনুষ্ঠান, বাহ্যিক সৎকর্ম্ম, পুণ্য আহরণ এই সব জড়িত। এই অর্থে ধার্ম্মিকতা ছিল খুবই। ধার্ম্মিকতা ছিল, কিন্তু ছিল না ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বলিতে আমরা বুঝি আধ্যাত্মিক প্রেরণাকে পূর্ণ অখণ্ড ভাবে অনুসরণ করিয়া চলা, আর

আধ্যাত্মিকতা বলিতে বুঝি আমাদের যে সর্ব্বোত্তম আত্মসত্তা, যে ভাগবত সর্ব্বব্যাপী একত্ব তাহাকে জানা, তাহাতে বসবাস করা, জীবনের প্রত্যেক অঙ্গকে তাহার দিব্যরূপে তুলিয়া ধরা। এই ধর্ম্মের প্রাচুর্য্য ত ছিলই না, বরং ছিল যথেষ্ট অপ্রতুল ; আর যতটুকুও বা খুঁজিয়া পাওয়া যাইত তাহা ছিল গণ্ডীবদ্ধ, সঙ্কীর্ণ। ভারতের এই সনাতন আদর্শকে খাট করিয়া ধরিলে রোগের প্রতিকার হইবে না, তাহা সুপ্রাচীনকালে ছিল যেমন তেমনি উদার করিয়া ধরিতে হইবে, আরও বৃহত্তর করিয়া ছড়াইয়া দিতে হইবে, যেন জাতির সমগ্র জীবন সত্য সত্যই এই আধ্যাত্মিক অর্থে মূর্ত্ত ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়। এই দিকেই দেখি আস্তে আস্তে ইউরোপের কাব্য, দর্শন, শিল্পকলা হাতড়াইয়া চলিয়াছে, অন্ধকারে অন্ধকারে চলিলেও তাহার পথে ক্রমশঃই আলো ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহার রাষ্ট্রনীতিক সামাজিক আদর্শাদির মধ্যেও নূতন একটা সত্যের প্রভা যেন বিচ্ছুরিত হইতেছে। কিন্তু এই সত্যের পূর্ণ জ্ঞান, এই আদর্শের সজ্ঞান প্রয়োগকৌশল একমাত্র আছে ভারতের ভাণ্ডারে। তাই ত যে সব তথ্যের ব্যবহার এক সময়ে ভারত করিতে পারে নাই, তাহা

আজ সে নূতন জ্ঞানের আলোকে সতেজ করিয়া ধরিতে পারে, তাহার পূর্ব্বতন সাধন-ধারায় যাহা কিছু ছিল জীর্ণ, অথর্ব্ব, তৎসমস্ত আজ সে সংস্কার করিয়া লইতে পারে। তাহার আধ্যাত্মিক আদর্শকে বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে জাঙ্গাল দেউল তুলিয়া দিয়াছিল, তাহাই পরে তাহার প্রকাশের বিস্তৃতির পথে অন্তরায় হইয়া উঠে; আজ সেগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহার অন্তরাত্মাকে সে দিতে পারে একটা মুক্তগতি, বিশাল লীলায়তন। ভারত যদি সঙ্কল্প করে, তবে মানবজাতি আজ যে সকল সমস্যা লইয়া বিব্রত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের দিতে পারে একটা অব্যর্থ মীমাংসা, একটা নূতন নির্দ্দেশ। সে সব সমস্যা-সমাধানের মূল সূত্র যে রহিয়াছে তাহারই প্রাচীন জ্ঞানের মধ্যে। ভারতের নবজন্ম আজ ভারতের সম্মুখে এই যতখানি সুযোগ আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপেই সে করায়ত্ত করিয়া উঠিতে পারিবে কি পারিবে না, তাহা জানেন ভারতের ভাগ্যবিধাতা।

———